জীবনের সাথী।

(পারিবারিক উপন্যাস।)

মোম্‌তাজ উদ্‌দীন আহ্‌মদ।

(প্রথম সংস্করণ)

১৩৫৪ বাং

এক টাকা মাত্র।

উৎসর্গ পত্র।

—:*:—

বঙ্গীয় মোস্লেমাকাশে উদীয়মান উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্ক,
বিপন্নের বন্ধু, বিদ্যা, বিনয় প্রভৃতি
মানবোচিত সদ্‌গুণের আশ্রয়
দানবীর—

নবাব মোশাররফ হোসেন,

খানবাহাদুর সাহেবের কর-কমলে ভক্তি-শ্রদ্ধার
নিদর্শন-স্বরূপ অর্পিত হইল।

বিনীত—
গ্রন্থকার।

প্রথম সংস্করণে—

'জীবনের সাথী' প্রকাশিত হইল। চারি বৎসর পূর্ব্বে পুস্তকখানার হস্তলিপি সমাপ্ত হয়। কিন্তু দারিদ্র্য-নিপীড়নে এবং বিশেষ কোন কারণে গ্রন্থকারের উৎসাহভঙ্গের দরুণ এত দীর্ঘকালের মধ্যেও ইহা আলোর মুখ দেখিতে পায় নাই।

কুমিল্লা মোক্তার বারের উদীয়মান সাহিত্য-সেবক মৌলবী আবদুল খালেক সাহেব পুস্তক প্রকাশের সম্পূর্ণ খরচ বহন করিয়া প্রকৃত বদান্যতার পরিচয় দিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহার নিকট আ-কেয়ামত ঋণী থাকিব।

যে যে সহৃদয় মহাত্মারা পুস্তকের হস্তলিপি প্রস্তুত কালে এবং ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনে সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহাদের সাগ্রহ পরিশ্রমের জন্য তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পুস্তকের বিশেষত্ব—মুসলমান সাহিত্যের এ অভ্যুত্থান-যুগে যথাস্থানে মুসলমানি শব্দের অকপট ব্যবহার করা হইয়াছে; অথচ অর্থ বুঝিতে মোটেই বেগ পাইতে হইবে না। আর, বৈধ-সম্মিলনের পূর্ব্বে নায়ক-নায়িকার সাক্ষাৎ অতি কৌশলে পর্দ্দানীতি রক্ষা করিয়া সংঘটিত হইয়াছে।

চরতস্তর, বাকিলা,
ত্রিপুরা।
২রা বৈশাখ, ১৩৩৫ বাং।

বিনীত—
এম্ আহ্মদ।

উপহার পৃষ্ঠা।

তোমায় কি দিয়ে সুখী হব, তাই নিয়ে মাথায় একটা তোলপাড় হচ্ছিল। অনেক চিন্তার পরে বাজার হ'তে এই পুস্তিকাখানা কিনে তোমার 'জীবনের সাথী' ক'রে দিলাম। সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিও, তুমিও সুখী হ'তে পারবে। ইতি

তোমার —

....

তাং .... | গ্রাম ....

১৯ ....ইং | পোঃ ....

জিলা ....

— —

সূচী।

প্রাপ্তি স্থান—

(১) গ্রন্থকার।

(২) প্রকাশক

(৩) ইসলামিয়া লাইব্রেরী, কুমিল্লা

(৪) ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা

(৫) প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী, ভিক্টোরিয়া পার্ক, ঢাকা

(৬) আর্, নাথ এণ্ড কোং রাজগঞ্জ, কুমিল্লা।

(৭) মুখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা।

(৮) হামিদীয়া লাইব্রেরী, ইসলামপুর, ময়মনসিংহ।

— —

জীবনের সাথী

প্রথম পরিচ্ছেদ

দুর্য্যোগ রাত্রি

আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষ, তাতে আবার নূতন বর্ষার জল সবুজ ঘাসের উপর স্ফটিকবৎ দৃষ্ট হইতেছে! চন্দ্রের রজত কিরণে সকলেই আনন্দিত,—পাতায় পাতায় কিরণচ্ছটা প্রতিফলিত হইয়া কি যেন এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি করিতেছে! প্রশস্ত দর্পণের মত সরোবর-পৃষ্ঠ জ্যোৎস্নার সহিত প্রতিযোগিতায় তাহাকে হারাইয়া দিতেছে। গ্রামের অনভিমানী রাখাল-বালকেরা প্রকৃতির এ সৌন্দর্য্যে অনুপ্রাণিত হইয়া দলে দলে মাঠের ধারে উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিয়া হাডু-ডুডু খেলিতেছে আত্মসম্মান অথবা নূতন আবহাওয়ায় স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রতি একেবারেই দৃক্‌পাত নাই। কোন কোন স্কুল কলেজের ছাত্র বা নামজাদা ধনীর পুতুল সাহিত্য-সেবার অনুরোধে নূতন জলে চন্দ্রালোক দর্শনে বাহির হইয়া রাখাল বালকের অসাময়িক খেলায় সহানুভূতি করা অপমানের কথা মনে করিয়া ভদ্রতার খাতিরে নাক সিট্‌কাইয়া তাহাদের পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে এবং তাড়াতাড়ি যাইয়া নিজ নিজ প্রকোষ্ঠে তালাবদ্ধ হইতেছে। বিহগ-কূজন একেবারে নীরবতা এখ তেয়ার করিতে পারে নাই। মাঝে একবার, খুব সম্ভব অসতর্কতা নিবন্ধন, প্রাতঃসূর্য্যের অচিরাগমন মনে করিয়া, একটি পাখী ডাকিয়া উঠিল-

"কাইচ্ছার মা গো, হল্‌দি দে গে।" এ রব বৃথা যায় নাই, ইহার যথেষ্ট সুফলতাও আছে। যে সকল দস্যু-তস্কর এতক্ষণ গভীর রাত্রির আগমনেচ্ছায় চোকে ঘুম মাখিয়া শায়িত ছিল, তাহারা এতক্ষণে বালিশ টানিয়া মাথায় দিল। নববধূরা স্বামীকে বাহির বাড়ীর বৈঠকখানা হইতে অন্তঃপুরে আসিতেছে না দেখিয়া, অদারজনী স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত থাকিবে চিন্তা করিয়া, হতভাগিনী বলিয়া অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিতেছে। তুলামিঞাও সেদিকে মুরুব্বিয়ানের সহিত বৈঠক-খানায় বসিয়াছেন, তাঁহাদের পূর্ব্বেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করা বেয়াদবি ভাবিয়া, মনে মনে যথেষ্ট বেয়াদবি করিয়া ফেলিতেছেন। আষাঢ় মাসের রাত্রি দেখিতে দেখিতে ঘনাইয়া আসিল; জ্যোৎস্না ও অন্ধকার দু'এর মধ্যে তুমুল সংঘর্ষ উপস্থিত। স্ত্রী জাতির জয়লাভ সমাজে ভাল দেখায় না, তাই অবশেষে জ্যোৎস্না পরাজিত ও অপসারিত হইতেই দূর হইতে খণ্ড খণ্ড অন্ধকার আসিয়া তৎস্থানগুলি অধিকার করিয়া বসিল। এখন অন্ধকার পূর্ণমাত্রা প্রকাশ করিতে পাইয়া জনপ্রাণী যাকে যার স্থানে বিলি করিয়া একাধিপত্য করিতে লাগিল। কেবল সে একাকী নয়; তার একাধিপত্যকে শায় দিয়া মাঝে মাঝে বজ্রধ্বনি ধীর-গভীর রবে মেদিনী কাঁপাইয়া অসৎসঙ্কল্পীকে ধম্‌কাইয়া শব্দায়মান হইতেছে। প্রবলবেগে পশ্চিমে-হাওয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে বিজলী চমকিয়া অসাবধান অথবা অসতর্ক বিপন্নদিগকে বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া পথ দেখাইয়া যার যার পথ ধরিতে ইঙ্গিত করিল। এই সময়ে গোবিন্দপুর গ্রামস্থ হড্‌সন্ ব্রীজের পার্শ্বস্থিত অশ্বশকট হইতে স্ত্রীকণ্ঠে ক্রোধাবিমিশ্রিত বিরক্তি-বোধক শব্দে শ্রুত হইল; "দাসীর ঝি! তাগ্‌দা চল।" তদুত্তরে ক্ষীণ-করুণ-কম্পিত-কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কেন মা! আব্বা ত আমায় কিছু বলে যান নি!"

হঠাৎ অশ্বযান হড্‌সন্ ব্রীজের উপর থামিয়া গেল ; এ দুর্যোগ রাত্রিতে একজন পুরুষ দুইটি রমণী সহ অবতরণ করিয়া চুপি চুপি কোথায় চলিয়া গেল। ঘর্ ঘর্ শব্দে আবার অশ্বশকট সম্মুখে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি

পাঠক চলুন আমরা হডসন্ ব্রীজের নিকট যাইয়া একবার শকটা-রোহীদের অনুসন্ধান করিয়া দেখি—তাহারা কে। ইহাদের পরিচয় বিশেষ অনুসন্ধান-সাপেক্ষ বলিয়া অবশ্য আমাদিগকে ধৈর্য্যশীল হইতে হইবে। পূর্ব্ববঙ্গের কাজীপাড়া গ্রামটী শরীফজাদা লোকের বসতি বলিয়া খুব প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কারণ স্থানে স্থানে চৌমুহনীকে পীরেকামেলের মাজার আখ্যা দিয়া খাদেম নামের উপযোগী হইতে পারিয়াছে বলিয়া অনেক নিরক্ষর গ্রামবাসীও খুব গর্ব্বিত এবং ধরাকে সরাজ্ঞান করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছে না। ভিক্ষাবৃত্তি তাহাদের যথেষ্ট সম্মানের কাজ, পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকাই তাহাদের জীবনের উদ্দেশ্য। তাহাদের সন্তান-সন্ততিরাও পৈত্রিক ব্যবসায় ত্যাগ করিয়া ক্ষেতের কাজ করিতে অপমান বোধ করে; কিন্তু ধর্ম্মসংক্রান্ত কোন গ্রন্থ হইতে দু-এক লফ্জ অথবা বয়াত গলৎ উচ্চারণের সহিত আওড়াইয়া মজলিশে তাহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিতে ও সাধারণ চক্ষে ধর্ম্মপ্রাণ বলিয়া পরিচিত হইতে আশাতীত পটু। এই কৃত্রিম বিচক্ষণতা কিন্তু বিশেষ সীমাবদ্ধ। যে স্থানের মোকররী মোল্লা তাহারা নহে, সেই স্থানে এই প্রতিপত্তি বড় একটা বজায় থাকে না। হায় রে অধঃপতিত সমাজ, এখনও সেই বাদশাহী চাল, ভিক্ষার ঝুলি স্কন্ধে—এখনও সে গর্ব্ব! এখনও সে অহঙ্কার!!

যাহা হউক, এই গ্রামের অধিবাসী কাজী আবদুর রসিদ সাহেব তাঁহার নমনীয় স্বভাব ও মধুরালাপের জন্য সকলের নিকট খুব সমাদৃত।

তিনি কর্কশ কথা বলিতে জানেন না। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাঁহাকে একবাক্যে ভক্তি-শ্রদ্ধা না করিয়া থাকিতে পারে না। তাঁহার বয়স অনূ্যন ৪০ বৎসর; কিন্তু এ অল্প বয়সেও মাথার চুল পাকিয়া সাদা হইয়াছে বলিয়া, সকলে তাঁহাকে "মাথা-বুড়ো সাহেব" বলিয়াও পরিচয় দিয়া থাকে। তিনি পরোক্ষে তাহা জানিতে পারিয়া মনে মনে কিছু লজ্জিত হন কিনা, তাহা আমরা জানি না। কাজী সাহেবের পরমা-সুন্দরী রূপলাবণ্যবতী কন্যা ছালেমা নবম বর্ষে উপনীত, এখনও বালিকা কোরাণ পাঠ শেষ করিতে পারে নাই। তাই কাজী সাহেব প্রত্যহ প্রাতে ঘরের পেছন-বারান্দায় বসিয়া তাহাকে কোরাণ পাঠ শিক্ষা দিয়া থাকেন। বালিকা দিনের অধিকাংশ সময় সেই প্রকোষ্ঠেই অতিবাহিত করে। এখন আর দুই বৎসর পূর্ব্বের মত বিশেষ কার্য্য ব্যতীত অন্দরের বাহির হয় না। যে প্রকোষ্ঠে বালিকা পিতার সহিত কোরাণ পাঠ শিক্ষা করে, তাহার অনতি-দূরে গ্রামের লোক চলিবার সাধারণ একটা পথ চলিয়াছে। পাঠ সমাপনান্তে প্রকোষ্ঠের জানালা-দ্বার দিয়া প্রাগুক্ত পথে চলিত লোকের পাদ-বিক্ষেপ গণনা করা তাহার এক অবিশ্রান্ত ও অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য হইয়া উঠিল। সে এখনও সংসারা-নভিজ্ঞ দুর্ব্বল-প্রাণা, তাই তাহার আম্মার কথানুযায়ী সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া থাকে, কিন্তু জানালা-দ্বার দিয়া দেখিতে কেহ নিষেধ করে নাই; তাই সে তাহার ভিতর দিয়া নির্নিমেষ-নেত্রে চাহিয়া থাকে। হঠাৎ উঠিয়া দৌড়িবার প্রবৃত্তি জন্মায় নাই, তাই মনে মনে সম্মুখ ফুল-বাগানে প্রস্ফুটিত বকুলের আগায় উপবিষ্ট প্রজাপতি ধরিবার স্পৃহা হইলেও সাহসের অভাবে ভিতরেই তাহা দমিত হইয়া যায়। পশ্চাৎ বারান্দায় সংলগ্ন বাগানখানা বাস্তবিক কাজী সাহেবের বড়ই সাধের। অভিনব-পল্লব-শোভিত লতিকাবলী প্রকোষ্ঠের দ্বারদেশের প্রচ্ছাদ-বস্ত্রের কার্য্য

সম্পাদন করিতেছে; শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা সূর্য্যের আতপ আদৌ অনুভূত হইতেছে না এই বিবিধ-কুসুম-শোভিত কাননের মধ্য দিয়া বালিকার দৃষ্টি চতুর্দ্দিক ভ্রমণ করিতেছে। তত্রত্য পাদপ-সমূহে কুসুমরাশি সতত বিকসিত হইয়া আছে। সেই সকল কুসুমের সুষমা দর্শনে দর্শনেন্দ্রিয়ের ও অমৃতায়মান সৌরভের আঘ্রাণে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা লাভ হয়। বাগানের অসূর্য্যম্পশ্য ভূ-ভাগেও ছোট পাখীদের কলরবে বালিকার সহজ দৃষ্টি সতত আকৃষ্ট হইতেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

দর্পণে যুগলমূর্ত্তি।

শুক্রবার। গ্রামের লোক সকলেই আজ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া জুম্মার নামাজ পড়িবার জন্য মস্‌জিদে যাইতেছেন। বিশেষতঃ কাজী সাহেব গ্রামের খতিব, তাই তাঁহাকে বিশেষ ভাবে সজ্জিত দেখিয়া কোমলমতি অনুকরণপ্রিয় বালিকা জিজ্ঞাসা করিল, "আব্বাজান নানা-বাড়ী যাবেন?" বালিকার স্বাভাবিক ধারণা ছিল যে, তাহার নানার বাড়ীতে যাইবার সময় তাহার পিতা ভাল পোষাক পরিধান করিয়া যান, তাই সে আজ কাজী সাহেবকে ভাল পোষাক পরিধান করিতে দেখিয়া মনে করিয়াছিল যে, তিনি তাহার নানার বাড়ীতেই যাইতেছেন। কাজী সাহেব এ প্রশ্নের যুক্তিসঙ্গত উত্তর দেওয়া সময়সাপেক্ষ মনে করিয়া, কেবল চশমার দড়ি ঘাড়ে বাঁধিতে বাঁধিতে এই বলিয়া চলিয়া গেলেন, "নাগো মা, আজ জুম্মার দিন ভাল পোসাক পড়্‌লে সোয়াব হয়।"

বিশ্বাসই ধর্ম্ম। বালিকা এখনও ধার্ম্মিক; সে কোন কথা অবিশ্বাস করিতে জানে না; পিতার সে এক-তরফা জওয়াবেও সারল্যের প্রতিমূর্ত্তি বালিকা তাহা স্বীকার্য্য মনে করিয়া লইয়াছে এবং পিতার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই ট্রাঙ্ক হইতে নিজের জরিপেড়ে নীলাম্বরী শাড়ীখানা পরিধান করিয়া দর্পণে মুখ রাখিয়া, আলোকাভাবে মলিন দেখিল। তাই ঐ পূর্ব্ব কথিত জানালার কাছে বসিয়া ঠিক জানালার বিপরীত-দিকস্থ টেবিলে দর্পণখানা রাখিয়া ইচ্ছামত এদিক সেদিক

মাথা নাড়িয়া সিঁথি কাটিতেছে। আর বালিকার অসাবধানতা বশতঃই হউক বা শৈশব-সুলভ-চঞ্চলতা ও অতিরিক্ত সরলতা হেতুই হউক, পশ্চাদ্দিকে তাহার ঘন সুচিক্কণ কৃষ্ণ-কেশদাম জানালার ফাঁক দিয়া বাতাসে এদিক সেদিক দুলিতেছে। তদ্দর্শনে মৌমাছি ফুল ছাড়িয় ভন্ ভন্ করিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। কিন্তু মৌমাছির উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে কি? বাস্তবিক, যাহা অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আপাতত মনোরম ও সদ্য, অপরিণামদর্শিরা এরূপ বিষয়ে সহসা আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইয়া থাকে। হঠাৎ মস্‌জিদে নামাজের গভীর আজানধ্বনি কানে তালা লাগাইয়া দিল. বলিতে বলিতে সেই আজানের স্বর্গীয় গভীর ধ্বনিতে যেন গ্রামের বাজে কোলাহল একেবারে নীরবতায় মিশাইয়া দিল এমন সময় পঞ্চদশ বর্ষীয় একটী সুশ্রী যুবক, চটি জুতা পায়, পরণে একখানা সাদা তহ্‌বন, গায়ে চুড়ীদার আস্তিনের পাঞ্জাবী পিরহান, মাথায় একটি তুর্কী টুপী পরিধান করিয়া খান কতেক কেতাব হাতে লইয়া শান্ত অথচ দ্রুতগতিতে আনন্দিত মনে কাজী সাহেবের পশ্চাৎ বারান্দার অনতিদূরে চলিত সাধারণ পথটী অনুসরণ করিয়া মস্‌জিদের দিকে ধাবিত হইতেছে; ইমাম্ সাহেব নমাজে গিয়াছেন কিনা, ডাকিবার জন্য ব্যগ্রসহকারে যেই মাথা উঠাইয়া দেখিল অমনি তাহার হা-করা মুখ বন্ধ হইয়া গেল। সে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল পথের বিপরীত দিকস্থ জানালার ভিতর দিয়া অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত গোলাপের ন্যায় মাধুর্য্যময়ী এক মৃদু-হাসিনী পরমাসুন্দরী বালিকা দৃষ্ট হইতেছে। তাহার অনুপম রূপলাবণ্য, মনোহর বেশভূষা, আলুলায়িত কেশপাশ, নয়নযুগলের অনির্ব্বচনীয় চটুলতা ও মাধুরী দর্শনে তাহার ভবিষ্যৎ পূর্ণ যৌবনের সৌন্দর্য্য কল্পনা করিয়া যুবক চমৎকৃত ও মোহিত হইয়া অধোবদনে অস্ফুট স্বরে বলিল, "হে খোদা, এই কি তার নেশান্?"

এদিকে, প্রকোষ্ঠের অদূরস্থিত পথ হইতে জানালার ভিতর দিয়া বালিকার গণ্ডস্পর্শ করিয়া এক সুন্দর সুঠাম ধার্ম্মিক যুবকের স্বর্গীয় দৃষ্টি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া বালিকা শিহরিয়া উঠিল; ইত্যবসরে বালিকা দ্বাদশবর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। তাহার অন্তরে প্রেমের বীজ অর্দ্ধোপ্তপ্রায়; কাজেই তাহার বুকের ভিতরে কি এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের সৃষ্টি হইয়া হঠাৎ যন্ত্রণাদায়ক হইল! পাঠক, একবার কল্পনা করিয়া দেখিবেন, দুইটী অপরিচিত যুবক ও যুবতীর চেহারা অকস্মাৎ প্রশস্ত দর্পণে এক সঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া কি এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যের অনুসূচনা করিতেছিল!! এই দৃশ্য কি মনোরম, ইহাতে কি মাধুর্য্য নিহিত, সংসার প্রবেশোন্মুখ দুইটি প্রাণীর ভবিষ্যৎটা কিরূপে চিত্রিত হইতেছিল তাহা ভুক্তভোগী ব্যতিরেকে অনুভব করা দুঃসাধ্য। তাই বালিকা, তদ্দর্শনে বাতাহত লতার ন্যায় বিনত মস্তকে প্রলুব্ধ-নয়নে দর্পণে তাকাইয়া রহিল; কিন্তু মুহূর্ত্তকাল অতীত হইতে না হইতেই যুবক সময় সঙ্কীর্ণ বোধে ধীর অনিচ্ছাকৃত পাদবিক্ষেপে নামাজে যোগদান করিতে গেল। আর বালিকা হঠাৎ সেই সৌম্যমূর্ত্তি দর্পণ হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে দেখিয়া চকিতা-হরিণীর ন্যায় অতীব সন্দিগ্ধ নয়নে চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিল. কোথাও কিছু নাই। তাই আবার সতত দর্পণের ভিতর দিয়া দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কাহাকে যেন খুঁজিতেছে। কাহারও অভাবে সে যেন সুখী হইতে পারিতেছে না।

এখন, এ সুশ্রী যুবক, যাহাকে দেখিয়া সংসারানভিজ্ঞা ছালেমার হৃদয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রণয়ের অঙ্কুর উপ্ত হইল, তাহার চরিত্রালোচনা করা আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য। "বড় সুন্দর" পূর্ব্ববঙ্গের আর একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম। এখানে অনেক গরীব ভদ্রলোকের বাস। তন্মধ্যে মুন্সী মহাম্মদ আব্বাছ খোন্দকার অন্যতম। ইঁহার তিন পুত্র,—দুইটি

এবার বি, এ, ক্লাসে অধ্যয়ন করিতেছিল; কিন্তু খোন্দকার সাহেবের দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইটি ছেলেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে। আর, সর্ব্বকনিষ্ঠ আবদুল মান্নান এবার স্থানীয় আব্বাছিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় জমাতে আওয়ালে পড়িতেছে। তাহার বয়স অনূন ১৫ বৎসর; কিন্তু শৈশবাবধিই স্বাস্থ্য সুখ উপভোগ করিতে পাইয়া চেহারাটা বাস্তবিক গোলাপের মত ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাহার নমনীয় স্বভাব, হৃদয়গ্রাহী কথা সকলেরই চিত্তবিনোদন করিয়া থাকে। তাহার বিদ্যাভ্যাসের রীতি কি উত্তম! সে বশ্যতা, পরিশ্রম, সদাচার ও বিদ্যানুরাগ নিত্য অভ্যাস করিয়া থাকে। পিতামাতা ধর্ম্মনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থ লোকহিতৈষণা, সম্মানাকাঙ্ক্ষা, অকপট ব্যবহার ও খোদাভক্তি—সকল গুণের বীজ শৈশবকালাবধিই স্বীয় সন্তানের অন্তঃকরণে রোপিত করিয়া দিয়াছিলেন।

কাজীপাড়া গ্রামের সুবামিঞা নামক জনৈক ভদ্রলোকের বাড়ীও কাজী সাহেবের বাড়ীর সম্মুখে অনতিদূরে অবস্থিত। আমরা অতঃপর কাজী আবদুর রসিদ সাহেবকে কেবল "কাজী সাহেব" আখ্যা দান করিব। কাজী সাহেবের বাড়ীর উপর দিয়াই স্থানীয় জুম্মা-মস্‌জিদের রাস্তা। সুবামিঞার একটি ছেলে মক্তবে পড়িতেছে। তাহার বয়স অনুমান ৬।৭ বৎসর। দেখিতে বেশ সুন্দর, সে-ই পিতামাতার একমাত্র ছেলে; তাই তাহাদের বড়ই আদরের ধন। একাকী মক্তবে যায়, তাই পথে ভয় পাইয়াছে বলিয়া পিতার কাছে আপত্তি করিয়াছে, তাহাতে পিতার প্রাণ পুত্রবাৎসল্যে আন্দোলিত হইয়া উঠিয়াছে এবং আদর করিয়া আবদুল মান্নানকে দুই তিন বৎসর হয় পুত্রের গৃহ-শিক্ষক নিযুক্ত করিয়াছেন। আবদুল মান্নান এখানে গৃহশিক্ষকতা করিয়া যাহা অর্জ্জন করে, তাহাতে তাহার পড়ার খরচ অনায়াসে চলিতেছে। ছেলেকে দৈনিক একঘণ্টা শিক্ষা দিয়াও সে সর্ব্বদা নিয়মিত সময়

মাদ্রাসায় উপস্থিত হয় এবং দিনের পড়া দিনই শিক্ষা করিয়া লয়। এতদ্দর্শনে গ্রামের অধিকাংশ ছেলেই তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে এবং নিজ বাটীতে কাহারও কাহারও শিক্ষক থাকা স্বত্বেও সময় সময় তাহাদের নিজ নিজ পড়া বলিয়া নিবার জন্য আবদুল মান্নানের নিকট আসিয়া থাকে। ইহাতে তাহার যে কিছু আর্থিক উন্নতি হইতেছে না, তাহাও নহে। মাঝে মাঝে অভাব হইলে এই গ্রামের ছেলেদের নিকট হইতে চাহিয়া অর্থ সমস্যার সমাধান করা হয়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে কাজী সাহেবের কন্যা ছালেমাও তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা আবদুচ্ছালামের সহিত আবদুল মান্নানের নিকট পড়িতে আসিত; এখন একটু বয়স্ক হইয়াছে বলিয়া তাহার আম্মা নিষেধ করিয়াছে, তাই প্রায় দুই বৎসর কাল অতিবাহিত হইল এখানে আর পড়িতে আসে না।

আজ শুক্রবার। কাপড়ে সাবান মাখিয়া আবদুল মান্নান শুইয়া শুইয়া একখানা উর্দ্দূ রেছালা পড়িতেছে। উর্দ্দূ ভাষায় অনেক দিন আগে হইতেই তাহার একটা সাধারণ জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাই নিঃশব্দে পাঠ করিলেও পঠিতাংশের অর্থ বুঝিতে তাহাকে বিশেষ বেগ পাইতে হইতেছে না। একদৃষ্টিতে কতক্ষণ যাবৎ চাহিয়া থাকিয়া হঠাৎ যেন তাহার ঈষৎ লাল গণ্ডদ্বয় নীলাভ হইয়া উঠিল। ভিতর হইতে হাসির ফোয়ারা সমস্ত মুখমণ্ডলে বিরাজিত; কিন্তু মুখটা অন্য কাজে ব্যস্ত বলিয়া হাসি আর প্রস্ফুটিত হইতে পারিল না। তখন তাহাকে অতি মাত্র উৎফুল্ল দেখাইতেছিল। কেন সে এত খুসী তাহা কেহই বুঝিতে পারিল না, সে নীরবে গুপ্ত খুসীর বিষয় পাঠ করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিল না, দুর্দ্দমনীয় স্পৃহার বশবর্ত্তী হইয়া সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া একটু আওয়াজ দিয়া পড়িল,—"বিচ্ উন্‌কে গোশাগির্ আত্তরতিঁ হেঁ নেহি ছুয়্যা উন্‌কো কুই আদ্‌মী পেশ্‌তর্ আওর্ না কুই জিন্; পছ্

কোন্‌ছি ন্যামতেঁ মে পর্‌ওয়ার্‌ দেগার্‌ কে তুম্‌হারি ঝুট্‌ লাতে হো।"
বেহশ্‌তাভ্যন্তরের সে পর্দ্দানেশিন্‌ ষোড়শী যুবতীকুলের কথা শুনিয়া—
যাহাদিগকে কোন দিন মানুষ কেন জিনজাতিও স্পর্শ করিতে পারে
নাই—সেই ষোড়শী-ললনা-কুলের কথা শুনিয়া যুবক আর বসিয়া
থাকিতে পারিল না। এই স্বর্গীয় সম্ভোগের আকাঙ্ক্ষায় কিঞ্চিৎ
শিথিলতা সম্ভবিলে খোদার সেই ভয়াবহ ভ্রূকুটির আভাস পাইয়া উহা
উপভোগ ইচ্ছায় সে তাড়াতাড়ি নামাজে যোগদান করিতে গেল।

কাজী সাহেবের সহিত আবদুল মান্নানের খুব পরিচয়। ছেলের
ওস্তাদ, তাই তাহাকে খুব ভালবাসে এবং কোন দিন কার্য্যোপলক্ষে
অন্যত্র গেলে জুম্মার খোত্‌বা পড়িবার জন্য তাহাকেই অনুরোধ করিয়া
যান। আজও কোথা গিয়াছেন কিনা জানিবার জন্য, যেই মাথা
উঠাইল, ছালেমাকে অতুলনীয় ভাবে সজ্জিতা দেখিয়া, অমনি সেই
উর্দ্দূরেছালার কথা তাহার মনে পড়িয়াছে এবং ভাবের উচ্ছ্বাসে,
এই বালিকাকেই, মানব স্বভাবানুরোধে, হৃদয়ে স্থান দিয়াছে। তখন
নামাজের সময় সঙ্কীর্ণ বোধে কিরূপ অনিচ্ছার সহিত যুবক তথা হইতে
চলিয়া গিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

নৈশমন্দির কল্পনা।

দিলালেরপাড়া কাজীপাড়ার সন্নিহিত গ্রাম। তন্মধ্যে জমাদার বাড়ীই সকলের চেয়ে প্রসিদ্ধ। সে বাড়ীর কর্ত্তা নেজামত আলী জমাদার একজন প্রবল ও প্রতিপত্তিশালী লোক, চাকর-নকর ইঙ্গিতে তাহার হুকুম তামিল করিতেছে। সুদের টাকার ভয়ে গ্রামের অধিকাংশ লোকই তাহার পদলেহন করিয়া চলিতেছে। তৎকৃত কোন অপকর্ম্মের প্রতিবাদ করা দূরের কথা, তাহাতে "হাঁ হুজুর" বলিয়া মাথা নাড়িয়া সায় না দিলে পরের দিন তাহার খতের নালিশ অনিবার্য্য! তাই এক দিক দিয়া দেখিতে গেলে, গ্রামের সুশৃঙ্খলাটী মন্দ নহে; আপাততঃ পূর্ণশান্তি বিরাজ করিতেছে বলিয়াই ভ্রান্তি হয়। কেবল মাঝে মাঝে, প্রকাশ্য রাস্তা ছাড়িয়া জমাদারের দুই খাতক একত্রিত হইবার সুযোগ পাইলে বুকে পিঠে আলিঙ্গন দিয়া একে অন্যকে দুঃখ-দৈন্যের আদান প্রদান করিয়া থাকে এবং বদন-মণ্ডলে নিরাশার ছায়া প্রতিফলিত করিয়া, খুব সঙ্কুচিত ভাবে, কি যেন অপমানের কথা, চুপি চুপি কানে কানে বলিয়া তাড়াতাড়ি আবার 'হাঁ হুজুরের' জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বাহ্নেই আমরা পাঠক-পাঠিকাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি যে নেজামত আলী জমাদারকেও অতঃপর কেবল 'জমাদার' বলিয়া সম্বোধন করিব।

জমাদারের ছেলে দানতুল্লা, সোণার গাঁ অবৈতনিক বিদ্যালয়ের ছাত্র। তাহার বয়স বর্ত্তমানে সপ্তদশ অতিক্রম করিয়াছে; নিম্নপ্রাথমিক

শ্রেণীতে উপর্য্যুপরি দুইবার অকৃতকার্য্য হওয়ায় সুচতুর জমাদার গৃহ-শিক্ষক রাখিয়া তাহার শিক্ষার দৌড় সাধারণ চক্ষে খুব লম্বা করিয়া দিল এবং পাঠ্যাবস্থায় রাখিয়াই নিজেদের চেয়ে ভদ্র পরিবারের মেয়ের সহিত বিবাহ দিতে স্বল্প ব্যয়ের ফন্দিটা ভিতরে ভিতরে খুব আঁটিতেছিল। গৃহ শিক্ষকেরও তাহা বুঝিবার বাকী ছিল না, তিনি অল্পদামের মোটা বহি খরিদ করিয়া ছেলের হাতে চাপাইয়া দিয়া বলিতেন, "সোর্ কর মৎ আহেস্তা পড়্হো।"

এই কথার রহস্য সকলে বুঝিত না, যে পরিবারস্থ দু'একজন বুঝিতে পারিত তাহারা, মাত্র একবার চক্ষু কোণে দৃষ্টি করিয়া শানতুল্লার আপাদমস্তক পরীক্ষা করিয়া লইত। মানবোচিত গুণানুরোধে দু'একজন বা 'পড়্তে জানেইনা' বলিয়া ফেলিতে চাহিত, কিন্তু জমাদারের রাগ-রাঙ্গা চোকের প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই যেন লাল পাতাকা সঞ্চালনে গমনোদ্যত ট্রেণ রেলের উপর হঠাৎ থামিয়া যাইত। আর কাহারও বাক্য স্ফূর্ত্তি হইত না, দুঃসাহসিকতায় নির্ভর করিয়া যে কেহ মুখ ব্যাদন করিত ওষ্ঠদ্বয় থর্ থর্ করিয়া কম্পিত হইয়া উঠিলে, কেহ "হাঁ হুজুর" কেহবা 'বহুত আচ্ছা' বলিয়া উঠিত। তন্মধ্যে নৈমদ্দি অসাবধানতাবশতঃ একদা বলিয়া উঠিল, "মিঞা-বাই আজকা চিঠি পড়্তেও পার্ছে।" জমাদার খুব উদ্ধত ভাবে 'চুপ' বলিয়া তাকে ধমকাইয়া দিতেই সে 'হাঁ হুজুর' বলিয়া হাটু গাড়িয়া মাটিতে বসিয়া জমাদারকে তিনবার ছালাম করিয়া দর্জ্জার আড়ালে গিয়া উপবেশন করিল।

সেদিনই পেয়াদা এক খানা সমন হাতে নৈমদ্দিকে বলিল, "মাথাবুড়া ছাব্‌কা ছমন্ হ্যায়, অন্দর্মে লে-যাও।" কারন পেয়াদা কাজীপাড়া গ্রামটী তালাস্ করিয়া জানিতে পারিয়াছিল যে, টাকার বিশেষ প্রয়োজন আছে ; তাই খুব সম্ভব কাজী সাহেব জমাদার বাড়ী

গিয়াছেন। নৈমদ্দি চিঠি হাতে বাহির বাড়ী ও আন্দর মহল্ তন্ন তন্ন করিয়া তালাস করিয়া না পাইয়া লানতুল্লার পাঠাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিল, জমাদার ও একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক দুইখানা চেয়ারে বসিয়া ছেলের লেখাপড়া সম্বন্ধে আলাপ করিতেছেন, আর ছেলেও গৃহ-শিক্ষকের অভাবে খুব পুরু একটা পুস্তক খুলিয়া নীরবে কি যেন আওড়াইতেছে। জমাদারের দৃষ্টি উপরে উঠিতেই নৈমদ্দি একখানা কাগজ আগন্তুক ভদ্রলোকের হাতে দিয়া দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া রহিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, কাজী সাহেব যদিও ৪০ বৎসর বয়স অতিক্রম করেন নাই, তথাপি বার্দ্ধক্যের সব লক্ষণ তাঁহার সর্ব্বাবয়বে বিরাজমান ছিল; তিনি এখন আর চশ্মা ব্যতীত কিছুই দেখিয়া পড়িতে পারেন না। তাই চশ্মা অভাবে কাগজখানা লানতুল্লার হাতে দিয়া তারিখ জানিতে চাহিলেন। লানতুল্লা কিন্তু এখনও টানা লেখা পড়িতে জানে না, তাই মাথা চুল্কাইতে চুল্কাইতে লজ্জিত-ভাবে বলিতেছিল, 'বেটাদের লেখা—'। ঠিক তন্মুহূর্ত্তেই গৃহশিক্ষক পায়খানা হইতে ফিরিয়া আসিয়া তাহার হাত হইতে কাগজখানা টানিয়া পড়িলেন, 'বাদী—কার্ত্তিকচন্দ্র সাহা আসল ১০০০৲ টাকা, সুদে আসলে মোট ১৫০০৲ শত টাকার নালিশ।' তারপর নাসারন্ধ্রের ভিতর দিয়া অস্পষ্টভাবে কি যেন পড়িয়া তাকের উপর হইতে পঞ্জিকাখানা খুলিয়া বলিলেন, 'বাংলা ২৭শে পৌষ মোকদ্দমা শুনানীর তারিখ।' কাজী সাহেব বিষণ্ণচিত্তে সমনখানা হাতে লইয়া দাঁড়াইতেই জমাদার কি বলিতে আরম্ভ করিয়া হঠাৎ থামিয়া গিয়া আবার সোৎসাহে বলিল, "আমি থাকতে আপনার ভাবনা কি?" কাজী সাহেবের এ কথার অর্থ বুঝিতে বাকী রহিল না। বিশেষতঃ জমাদারের গৃহ-শিক্ষকের মুখে ইতিপূর্ব্বে তিনি যে অপ্রীতিকর সংবাদ কর্ণস্থ করিয়াছিলেন, এখনও

স্বয়ং জমাদারের মুখে তাহার আভাস পাইলেন মাত্র। তিনি আর তথায় থাকিতে পারিলেন না, বিষণ্ণচিত্তে বাড়ী রওয়ানা হইলেন। তখন সন্ধ্যার অন্ধকার খুব নিবিড় বলিয়া বোধ না হইলেও জমাদার দয়া-পরবশ হইয়া কার্পণ্যতার কিছুটা লাঘবতা হইতে দিয়া কেরোসিন-তৈলে পূর্ণ, ব্যবহারাভাবে মর্‌চে-ধরা একটা অটুট্ হ্যারিকে'ন কাজী সাহেবের হাতে দিয়া যথেষ্ট আপ্যায়ন দেখাইলেন। ইহা জমাদারের চরিত্রের ঘোর পরিবর্ত্তন বলিয়া নৈমদ্দি লানতুল্লার দিকে একটি বক্র-কটাক্ষ হানিয়া অনুচ্চারিত ভাষায় কি যেন বলিয়া হাসিয়া চলিয়া গেল। সে কাজী সাহেবকে যথেষ্ট চিনে, এবং কাজী সাহেবের এক কন্যা এখন কোরাণশরিফ্ পাঠ সমাধা করিয়াছে, ইহাও সে জানে। বিশেষতঃ সে লানতুল্লার গৃহ-শিক্ষককে একদিন বলিতে শুনিয়াছিল, "আরে ব্যাটা পড়্না কয়দিন, তোর বাপ্ ত বিয়ের যোগারে আছে।" তদ্‌উপরি তাহার মনীবও লক্ষপতি লোক, তাই সে কাজী সাহেবের কন্যার সহিত জমাদার-পুত্র লানতুল্লার বিবাহটা কল্পনা করিয়া নিয়াছিল। ইহা নৈমদ্দির কল্পনা বলিয়া এই মানসিক প্রস্তাবনাকে আমরা সম্প্রতি উপেক্ষা করিতে পারি না। দেখা যাক্ কিসে কি হয়, খোদা সকলকে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে একই প্রকার পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়াছেন, কেবল ঐ খোদা-প্রদত্ত পবিত্র আত্মাই জাগতিক কার্য্যানুশীলনে অসৎ ও মহৎ হইয়া থাকে এবং অসততা ও মহত্বই মানব-স্থূলদর্শীর নিকট অযথাযথভাবে অনুভূত হইয়া পাপ-পথে প্রশ্রয় দিয়া থাকে। আমরা মানুষরূপে মানুষকে নিন্দা করিবার অধিকার পাই নাই। কারণ মানুষ তাহার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক অথবা সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উভয়-দিকের কার্য্য-কলাপের সমবায়ে ভাল মন্দ বিবেচিত হইবে। কাহারও সামাজিক ব্যবহার আমাদের দৃশ্যেন্দ্রিয়ের ক্ষমতাধীন, তাই আমরা

ন্যায়তঃ তাহাকে দোষী বা নির্দ্দোষ প্রমাণ করিতে পারি। কিন্তু তাহার আধ্যাত্মিক চরিত্র আলোচনা করিতে যাইয়া, সে কি ভাবে, কি চিন্তা করে, কি ধ্যান করিয়া জীবন কাটায়, কাহাকে সে ভালবাসে, কি সে চায়, এবং কোন্ দিকেই বা তাহার মনের গতি, এই সকল বুঝিয়া উঠা, এমন কি কল্পনা করাও মানব-শক্তির অতি দূরে। তাই বলিতেছিলাম, কাহারও মানসিক গুণাবলির আলোচনা অসাধ্যবোধে বাহ্যিক-চরিত্র দেখিয়া, ভাল অথবা মন্দ মন্তব্য জারি করা কোন যৌক্তিকের নিকটই সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হইবে না। কাজেই মানুষ হিসাবে কাহাকে নীত্যানুরোধে সৎ বলিতে পারিলেও অসৎ বলিতে মানুষ সম্পূর্ণ অনধিকারী। 'যে ব্যক্তি যে পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত, সে সেই পরিমাণে সামাজিক ভাবে অবনত হইলে, অথবা যে পরিমাণে সামাজিক ভাবে উন্নত, সেই পরিমাণে আধ্যাত্মিক ভাবে অবনত হইলে খুব প্রশংসনীয় না হইলেও বিশেষ দোষনীয় নহে। তাই বলিয়াছি নৈমদ্দির কল্পনাকে আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না; সম্বন্ধ হওয়া না হওয়া খোদার ইচ্ছা। যাহা হউক কাজী সাহেব আলোহস্তে বাড়ী চলিয়া গেলেন। এদিকে জমাদার অন্দরে বাহিরে কয়েকবার 'আনা-গুনা' করিতে করিতেই রাত্রি ৮টা বাজিয়া গেল। আজ বৈঠকখানায় একবার গিয়াই সেখানে আর তিষ্ঠিতে পারিল না। কি যেন গোপনীয় কথা তাহাকে দংশিতেছে; তাহা এখনও কাহারো নিকট প্রকাশ করিতে না পারায় দংশন উত্তরোত্তর যন্ত্রণাদায়ক হইতেছে। তাই সে একবার মাত্র উকি মারিয়া দেখিল, কোনও খাতক সুদের টাকা লইয়া আসিয়াছে কিনা, কিন্তু কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া আজ কতকটা সন্তুষ্ট হইয়া গৃহ-শিক্ষককে লইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল। জমাদার-স্ত্রী মুসলমান ধনি-পত্নী বোধে পর্দ্দা রক্ষার জন্য

চতুর্ভুজাকারের-যথেষ্ট-চোক-বিশিষ্ট একখানা জালীবেড়ার কাছে বসিয়া জমাদারকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, 'মাছ্টর সা'ব্ কিতা কয়।' বাড়ীর সকল লোকেই গৃহ-শিক্ষককে 'মাষ্টার সা'ব' বলিয়া ডাকিত। তদুত্তরে জমাদার গৃহ-শিক্ষককে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "কি বুঝ মাষ্টর্?"

গৃহশিক্ষক—তা—হতে পারে, কিন্তু—।

জমাদার—কিন্তু কেন? খুব অভাবে আছে যে!

গৃহশিক্ষক—তা—ত স্ব-চক্ষেই দেখেছি। তা হলেই বা কি হয়?

জমাদার স্ত্রী—ইস্ আর কইছিলাম্ না, আমার লানত্ যদি বাইচ্চা থাহে, তবে কত কাজী মাগ্নাও মাইয়া দিব।

জমাদার, পত্নীর প্রতি বিরক্ত হইয়া, "তুমি মাটী কর্ইয়া দিলে সব্, মাগীটির বুক না ফুট্তে মুখ ফুটে আগে" বলিয়া গৃহ-শিক্ষককে অঙ্গুলী সঞ্চালনে বলিল, "একেবারে এক থলিয়া পূরা।"

গৃহশিক্ষক - আচ্ছা মেয়েটী কেমন?

জমাদার—খুব সুন্দরী। দশবার বচ্ছর বয়স, আবার কোরাণ পড়্তেও জানে। শুনেছি কেতাব পড়াও নাকি আরম্ভ করিয়াছে। সদ্বংশজাত এ কথা আর বলিতে হইবে না, এমন দু'একটা সম্বন্ধ কর্তে পার্লে আর ধরে কে? একেবারে ধনে-জনে-সম্মানে সকল দিকে সমান হইবে।

জমাদার পত্নী -- আরে বাবা! মৌলবী বউ ত আমার খাট্বো না, মৌলবীগিরিতে আর আমার চল্বো না! বউ থাক্বো কোরাণ-কিতাব লিয়ে, আমার এ বুড়া ব'সে আর এট্টু অব্সরও নাই?

জমাদার—আরে চুপ কর্; একবার আন্তে পারলে তাইর মা সহ খেজ্মত কর্ইয়া কূল পাইবো না।

এতক্ষণ যাবত গৃহ-শিক্ষক স্বামী-স্ত্রীর বাক্‌বিতণ্ডা শুনিয়া মনে মনে

একবার হাঁ, দুইবার না বলিতেছিলেন, কিন্তু অকস্মাৎ 'ছাত্রপরিণয়ে অনেক টাকা ছালামী মিলিবে, বিশেষতঃ জমাদার অত্যন্ত ধনী লোক' এই কথা মনে হওয়ায় তাহার দুর্দ্দমনীয় ধন-স্পৃহা ভিতর হইতে ধাক্কা দিয়া তাহাকে বলিতে দিল—"আচ্ছা দেখা যাউক, প্রাণপণ চেষ্টায় অসাধ্য কিছুই নাই"—বলিয়া তিনি বিশৃঙ্খল দীর্ঘ কোঁকড়ান গোঁপরাজিকে দুই হাতে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দিয়া বর-পক্ষের কোন আদেশের অপেক্ষায় উৎকর্ণ হইয়া রহিলেন।

এতক্ষণে তৃষ্ণাতুর জমাদারের হা-করা মুখে আশা-বারি সিঞ্চিত হইল। তিন দিনের ভিতরই স্বয়ং গৃহ-শিক্ষককে কাজী সাহেবের মেয়ের ঘটকালী করিতে পাঠাইবেন স্থির করিয়া যেই তাহার দিকে দৃষ্টি করিল অমনি জমাদারের বিধবা কন্যা সান্ধ্যভোজনের অন্ন-ব্যঞ্জনাদি আনিয়া সম্মুখে স্থাপন করিল। জমাদার ও গৃহশিক্ষক উভয়েই উপস্থিত প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া দক্ষিণ-হস্তের ক্রিয়া আরম্ভ করিয়া দিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

কাজী সাহেবের দৈন্যদায়।

রবিবার। টাকার বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কাজী সাহেব তাহার সংগ্রহে কোথায় গিয়াছেন; বাড়ীতে এখন আর পুরুষ কেহই নাই। সূর্য্য তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্য সমাধা করিয়া পশ্চিমাকাশে মুক্ত-হৃদয়ে চলিয়া পড়িতেছে দেখিয়া ললনাগণও প্রতিযোগিতার সহিত তাহার অনুসরণ করিতেছে। সকলেই ব্যস্ত; বাজে কোলাহল তাহাদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়া আস্তে ফিরিয়া আসে। সেদিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। এমন সময় ছালেমা তাহার আম্মার আঁচল ধরিয়া টানিয়া আস্তে বলিয়া দিল, "কে একজন সরকারী লোক বাহিরে দাঁড়াইয়া"। কাজী সাহেবের বিবি অনন্যোপায় হইয়া পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া তৃতীয় ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "জিজ্ঞাসা করতঃ ইনি কি চায়?" অমনি পেয়াদা রোষভরে বলিয়া উঠিল, "সুন্‌তানেহি কান্‌ছে, মাথা-বুড়া ছাব্‌কা সমন্ হ্যায়?" পেয়াদা এ কথার প্রত্যুত্তরে, "বাড়ীতে নাই, জমাদার বাড়ী গিয়াছে" শুনিতে পাইয়া অমনি তথা হইতে চলিয়া গেল। তৎপর অনুসন্ধান করিতে করিতে জমাদার বাড়ীতে কাজী সাহেবের খোঁজ করা হয়। তথায় যাহা সংঘটিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

আসুন পাঠক, এখন আমরা কাজী সাহেবের অন্দর-মহলে ঢুকিয়া পড়ি। পেয়াদা যাওয়ার পরেই, বিবীসাহেবা কোথা হইতে কিসের সমন আসিল, বুঝিতে না পারিয়া ভিতরে ভিতরে ছটফট্ করিতে লাগিলেন। আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন মাথায় পড়িবার উপক্রম হইল!

হৃদয় ব্যর্থ হইতে চলিল। কিন্তু সম্পদ না বিপদ, এই আশা-মিশ্রিত নিরাশার উত্তেজনায় অবলা-নারী-হৃদয় বাস্তবিক অস্থির ও অশান্ত হইয়া উঠিল। পলে পলে বাড়ীর দরজায় যাইয়া কাজী সাহেবের আগমন আকাঙ্খা করিতে লাগিলেন। কিন্তু হায়, দুঃখের সময় আর যায় না, তখন মিনিট যেন ঘণ্টা, দিন যেন মাস, এবং বৎসর যেন শতাব্দী বলিয়া অনুমিত হয়। আজ আর সন্ধ্যা আসে না। বিবীসাহেবার দৃঢ় বিশ্বাস কাজী সাহেব মগ্‌রেবের নমাজ বাড়ীতেই পড়িবেন্। কারণ এই সময় তিনি নমাজের বিছানায় বসিয়াই ঘণ্টা পরিমাণ কাল খোদার জিকির আজ্‌কার্ করিয়া থাকেন। ইহা কাজী সাহেবের দৈনিক কর্ত্তব্য ছিল। কিন্তু বিপদ সময় খোদা-স্মরণ বড়ই কষ্টকর, তাই আজ তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মগ্‌রেবের সময়টা সুদখোর জমাদারের ইষ্টকালয়ের প্রকোষ্ঠেই অতিবাহিত হইয়া গেল। "পনের শত টাকার নালিশ" এই কথা তাহাকে একেবারে বাক্‌শক্তি-রহিত করিয়া ফেলিল। তিনি অতি কষ্টে পথ চলিতে চলিতে আকাশ-পাতাল গণিয়া অবশেষে বাড়ীর দরজায় আসিয়াছেন। বিবী সাহেবা জানালাদ্বার দিয়া আলো হস্তে একজন লোক আসিতেছে দেখিয়া নীরবে বুঝিতে চেষ্টা করিলেন, এ কে। হঠাৎ যেই লোকটী একটু কাসিয়া দরজা ধরিয়া টানিল, অমনি তিনি উড়িয়া গিয়া দরজার খিল্ খুলিয়া দিলেন এবং কাজী সাহেবের মুখের দিকে তাকাইয়াই হতাশচিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপ্‌নাকে এমন দেখায় কেন? কি হয়েছে শীঘ্র আমাকে বলুন্" কাজী সাহেব, "সব হয়েছে, আমার মাথামুণ্ডু," বলিয়া মেজের উপর ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়িয়া পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিলেন। বিবী সাহেবা কাগজের প্রতি চোক ঘুরাইয়া তাকাইবার সঙ্গে সঙ্গেই ছালেমা তাহা কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে লাগিল,

"মোকর্দ্দমা নিষ্পত্তি করণার্থ সমন।

[দেওয়ানী কার্য্যবিধি আইনের ১৬ হুকুম, ১ ও ৫ নিয়ম।]

জেলা ত্রিপুরা, মোকাম সোনার গাঁ ১ম মুনসেফী আদালত।

মোকর্দ্দমা নং ২২৮২ সন ১৯২২ সন——খৃষ্টাব্দ।

১। শ্রীআবদুর রসিদ কাজি পিং মৃত আবদুল জলিল কাজি সাং কাজীপাড়া পোঃ মহব্বৎপুর থানা মেলান্দহ্ প্রতি

যেহেতু শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র সাহা বাদী তোমার নামে লগ্নিতের টাকা বাবদ মং ১৫০০৲ শত টাকার (আসল ১০০০৲ সুদ ৫০০৲) যে মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিয়াছে অতএব উক্ত বাদীর নালিশের উত্তর দিবার জন্য ১৯২১ ইংরাজি সালের ১১।১ তারিখে বেলা ১০ ঘণ্টার সময় তুমি স্বয়ং অথবা উপযুক্ত শিক্ষিত ও মোকর্দ্দমা সংক্রান্ত আবশ্যক প্রশ্ন সকলের উত্তর দিতে সক্ষম কোন উকিলের দ্বারা অথবা সক্ষম কোন ব্যাক্তিকে তাহার সঙ্গে দিয়া এই আদালতে উপস্থিত হওনার্থে তোমাকে এই সমন দেওয়া গেল। এবং তোমার উপস্থিত হওয়ার জন্য যে দিন ধার্য্য হইল, তাহা মোকর্দ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করিবার নির্দ্ধারিত দিন হওয়াতে সেই দিন তুমি নিজ উত্তরের পোষকতায় যে যে সাক্ষী ও দলিলের উপর নির্ভ.. .....";

এতক্ষণ একাগ্রচিত্তে মেয়ের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বিবী সাহেবা হতাশভাবে সজলনেত্রে কাজী সাহেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তাই ত! এতক্ষণ যাবত সমনের কথা শুনিয়া অবধিই আমার বুক ধড়ফড় ক'রে বেদনা হতেছিল, হায়রে খোদা তুই কি মছিবতে ফেল্লি! আর উপায় নাই!!" অসূর্য্যম্পশ্যা অবলা চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন, পৃথিবী তাঁহার চারিদিকে ঘুরিতে লাগিল। তিনি স্থির থাকিবার একটু জায়গাও খুঁজিয়া পাইলেন না। ইত্যবসরে কাজী সাহেব প্রকৃতিস্থ

হইয়া দেখিলেন, একি সর্ব্বনাশ! স্ত্রী মূর্চ্ছিতা, কন্যা কাছে প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া আছে। কোনও কথা বলিবার সামর্থ্য নাই. স্ত্রীর চেহারা মলিন, চোক সাদা হইয়া গিয়াছে, তাহাতে আবার পলক নাই, চক্ষু-গোলক নিশ্চল। তাই তিনি আর বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাড়াতাড়ি উঠিয়া স্ত্রীর মাথায় শীতল জল ঢালিয়া দিয়া বিছানায় রাখিলেন এবং কোমল-মতি কন্যাকে কোলে লইয়া, "কি মা! ছালেমা, অই যে তোর মা চোক মেলিয়াছে।" ইত্যাদি সান্ত্বনা-পূর্ণ বাক্যে তাহাকেও প্রকৃতিস্থ করাইলেন। বালিকা পিতার আব্‌দার দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল. "আব্‌বা, কি হয়েছে?" "আর বিশেষ কি হয়েছে, মা! কাত্তিক সাহা হাজারটা টাকার নালিশ করেছে মাত্র।" "এখন কি হবে, আব্‌বা?" "আর কি হবে মা. বিশেষ কি? নেজামত আলী জমাদার আশা দিয়েছে; বোধ হয় তিনিই টাকা দিবেন, সব মিটমাট হয়ে যাবে।" কাজী সাহেব, এখনও জমাদারের 'আমি থাকতে আপনার ভাব্‌না কি?' কথাটার মর্ম্ম উদ্ধার করিতে চেষ্টা করেন নাই। তথাপি নির্ভীকতা ও শান্তি উৎপাদনে স্ত্রী-কন্যাকে প্রবোধ দিবার জন্য এই বদান্যতা ও সৌজন্যের কথাটা প্রকাশ করিলেন।

যেই মাত্র কাজী সাহেবের এই বিপদমোচনসূচক কথাটা বিবী সাহেবার কর্ণে প্রবেশ করিল, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে তিনি যেন অমৃতপানে অর্দ্ধমৃতাবস্থা হইতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়া চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছেন। না, আস্তে আস্তে হস্তে ভর করিয়া বসিলেন এবং এতক্ষণ যাহা শুনিয়াছেন, তাহা বাস্তব কি স্বপ্ন, প্রমাণ করিবার জন্য কাজী সাহেবের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ নেত্রে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন. "জমাদার কি বলেছে? সে কেন আমাদের টাকা দিবে? আম্‌রা কি তার ছেলের কাছে ঘরের মেয়ে বিক্রয় করেছি, যে সে এতগুলি টাকা আমাদিগকে দিবে? তা'

হতেই পারে না, অসম্ভব, সম্পূর্ণ অসম্ভব!" এই বলিয়া তিনি আবার মূর্চ্ছিতা হইলেন।

'তার ছেলের কাছে ঘরের মেয়ে বিক্রয় করেছি।' বিবি সাহেবার এই শেষোক্ত বাক্যটী শুনিয়া কাজি সাহেব হঠাৎ শিহরিয়া উঠিয়া ফোঁস্ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস টানিয়া তাহা আস্তে ছাড়িয়া দিলেন। তাহাতে যেন নিশ্বাসের সঙ্গে এক সন্দেহ-কালিমা ভিতরে প্রবেশ করিয়া আবার প্রশ্বাসের সঙ্গে বাহির হইয়া গেল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যেই তিনি জমাদারের, 'আমি থাকতে আপনার ভাবনা কি?' কথাটার তাৎপর্য্য বুঝিয়া লইলেন। সঙ্গে সঙ্গে মনের ভিতর এক মহতী সভার অধিবেশন হইল;—ইহাতে অদ্যকার বিশেষ আলোচ্য বিষয়, 'লালতুল্লার সহিত ছালেমাকে বিবাহ দিব কি না'। যখন সম্মুখ-বিপদ্ এবং আশাতীত অর্থ স্পৃহাটা হৃদয়ে খুব প্রখর ভাবে জাগিয়া উঠিয়া অভাবের পথ পরিষ্কার দেখাইয়া দেয়, তখন যেন আশার ক্ষীণরেখা অঙ্কিত করিয়া প্রস্তাবনাকে গৃহীত করে। আবার যখন তিনি কল্পনা করিলেন, 'হায়, আমার চক্ষের মণি, কোলের পুতুল, সরলাকে কোন প্রাণে একটা অসৎ পরিবারে টাকার লোভে নিজের অভাব মোচনের জন্য বিক্রয় করিব? হায়, কন্যার পিতা হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন? না, আমি পিতা নহি, আমি স্বার্থপর, আমি পরম-শত্রু, আমি দাসী ব্যবসায়ী। হইলাম না হয় দাসী ব্যবসায়ী, কিন্তু কোন মুখে আমি লোক সমাজে এই উলঙ্গ নয়নযুগল এবং অবারিতাননের সদ্ব্যবহার করিব? হায়, যাকে আজ, নয়নের তারা বলিয়া প্রাণ রজ্জুতে বাঁধিয়া রাখিয়াছি, কি করিয়া তাহাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করিব? এ ঘরে বিয়ে দেওয়া, আর দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ করা একই কথা। শ্বশুর অতি দুর্দ্দান্ত, অতি দুরাচার, প্রজাদিগের উপর নিয়ত যৎপরোনাস্তি অত্যাচার করিতেছে।

প্রজারা তাহার দাস! কত নিরীহ লোকের শোণিতে তাহার হাত দূষিত হইয়াছে। অতৃপ্ত ধনতৃষ্ণা দিন দিন তাহাকে ঘৃণ্য স্পর্দ করিতেছে, অর্থগৃধ্নুতা দিন দিন তাহাকে ঈর্ষাপরায়ণ ও নিষ্ঠুর করিতেছে। আর তার ছেলে, যার হস্তে যাদুমণিকে জীবনের জন্য অর্পণ করিব, সে কেমন? সে কি সৎ! সে কি বিনয়ী!! সে কি সুবোধ এবং শিক্ষিতই বা কেমন!!! আমার প্রাণপ্রতিমাকে সুখী করিতে পারিবে কি? না—অসম্ভব, শতগুণ অসম্ভব, লেখাপড়ায় যেমন তা'ত সেদিন সমন পড়তে আমার চোকের সামনেই প্রমাণিত হইয়া গেল। আর শুনেছি অসৎ সঙ্গে প'ড়ে একেবারে বদ্‌মায়েস হ'য়ে গিয়েছে, উদ্ধত স্বভাব, যাকে তাকে মন্দ বলিতে দ্বিধা নাই, পর দ্রব্য হরণ, লম্পটদিগের সহিত গাঁয়ে ঘুরা-ফেরা তাহার নিত্য কর্ম, হবে না কেন! ছেলেটীর মাথা গজাইয়া উঠেছে, ১৭।১৮ তার বয়স, অথচ নিম্নপ্রাথমিক শ্রেণীতে কিনা দুই বার ফেইল্। আঃ হতভাগিনী বালিকে! যে পিশাচ পিতা কন্যা-রত্নকে এমন ঘরে বিয়ে দেওয়ার কল্পনাও করিতে পারে, কেন তার ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেছিলে? এত আলোচনার পরে মনের সভা ভাঙ্গিল, রিজলিউসন করা হইল, 'আমি অর্থের খাতিরে একটী জীবনকে নষ্ট করিতে পারিব না।'

বিবি সাহেবা ইতিমধ্যে চৈতন্য লাভ করিয়া কাজি সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার জন্য তাঁহার দিকে লক্ষ্য করিয়া কয়েকটী বাক্য উচ্চারণ করিয়া কোন সাঁড়া না পাইয়া চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, আর কেবল উদ্বেগ, চিন্তা ভয় তাহার হৃদয়ে উদ্ভূত হইয়া উঠিতেছিল। ছালেমা পিতার ক্রোড়ে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কাজী সাহেবকেও নিদ্রাভিভূত বলিয়া অনুভূত হইল। আর অন্যান্য সকলেই গাঢ় নিদ্রায় অচেতন, কিন্তু তাঁহাকে নিদ্রা একেবারে ত্যাগ করিয়াছে, শূন্যতা,

ব্যাকুলতা তাহার নয়নে নিরন্তর লক্ষিত হইতেছিল। তাঁহার শরীর শীর্ণ, মুখ বিবর্ণ। তিনি সতত কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেছেন। এমন সময়ে চিন্তাক্লিষ্ট নিদ্রালু কাজী সাহেবকে মাথা নাড়িয়া হৃদয়ের খুব অন্তঃস্থল হইতে কি বলিতে শুনা গেল। তাঁহার উচ্চারিত বাক্যাবলীর সম্পূর্ণ অংশ স্পষ্ট শব্দায়মান হইল না। কেবল শুনা গেল—"আমি—অবু·· · খাতিরে······জীবনকে নষ্ট······রিতে·· ··রিবনা।" হঠাৎ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া বিবীসাহেবাকে সম্মুখে দেখিয়া অমনি উচ্চারিত কথাগুলির মর্ম্ম গোপন রাখিবার ফন্দি কাটিয়া বলিলেন, "আরে রাত্ ত অনেক হয়েছে, আর বসে ভাবলে কি হবে?" বিবী সাহেবা কিন্তু কম চালাক নহেন. তিনি এই ছাটা উত্তরে সন্তুষ্ট হইবার পাত্রী নহেন। বিশেষতঃ তিনি বড় ঘরের মেয়ে, তাই কাজী সাহেবের বাড়ীতে আসিয়া অবধিই তাঁহার প্রতিপত্তিটা মন্দ নহে। এমন কি স্বয়ং কাজীসাহেবও কোন কোন বিষয়ে বিবী-সাহেবার সহিত এক মতাবলম্বী হইতে না পারিলে বিশেষ সুখী হইতে পারেন না। প্রকাশ্য ভাবে কাহারও সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার না করিলেও ভিতরে ভিতরে তিনি গর্ব্বিতা। প্রতিবেশী কি আত্মীয়স্বজনের সহিত কথাবার্ত্তায় পিতৃকুল গৌরবের দুই একটা টিকা টিপ্পনী না কাটিলে তাঁহার আলাপের পূর্ণত্ব রক্ষা হয় না। যাহারা তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছে, তাহারা আর দ্বিতীয় বার এরূপ আলাপের স্বাদ গ্রহণ করিবার আকাঙ্ক্ষা করে নাই। কিন্তু সাধারণতঃ এমতাবস্থায় গ্রাম-বাসিনীগণের বিশেষ সহানুভূতি পাওয়ার কোন যো না থাকিলেও পেটের দায়ে অভাবগ্রস্ত মেয়েছেলেরা বিবী-সাহেবার কাজে যথেষ্ট সাহায্য করিত এবং কাজীসাহেবের অমায়িক ব্যবহারে পত্নীর কর্কশ ব্যবহার ভুলিয়া যাইত। তাই এ পরিবারটী এতকাল ষোল আনি সম্মান

বজায় রাখিয়া সংসার ধর্ম্ম করিবার সুবর্ণ সুযোগ পাইয়াছিল। তিনি কাজীসাহেবের এই কথার দ্বিরুক্তি আগামী কল্য করিবেন স্থির করিয়া লইলেন। পরিবারস্থ সকলেই খাওয়া দাওয়া ও অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া শয়ন করিতে গেল। তাহাদের সঙ্গে আমাদের শোক-সন্তপ্ত দম্পতি যুগলও নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় লইলেন। কিন্তু এ শয়ন তাহাদিগকে মানাইল না। তাহারা হা-হুতাশে বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

খোন্‌-পুতের ঘটকালি।

আজ সোমবার। এখনও প্রাতঃসূর্য্য মানব-দৃষ্টি-গোচর হয় নাই। কিন্তু উত্তরোত্তর চোক রাঙ্গাইয়া যেন তাহার প্রাখর্য্যের পূর্ব্বাভাসটা বেগে জাহির করিতেছে। বৃক্ষের ডালে ডালে পাখীসব কিচ্‌মিচ্‌ শব্দ করিয়া গ্রামটীকে মুখরিত করিয়া তুলিয়াছে। অদূর মস্‌জিদ হইতে আজানের সুমিষ্ট ধ্বনি নিদ্রালু লোকের কাণে কি অনুপমেয় শান্তির অবতারণা করিতেছে। সেই সুললিত ধ্বনি শ্রবণ করিয়া ধার্ম্মিক মুসলমানমাত্রই নামাজে যোগদান করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। স্কুল মাদ্রাসার ছাত্র এই মাত্র গাত্রোত্থান করিয়া তাহাদের প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া মর্ণিং ওয়াকে বাহির হইয়াছে, আর মলয় হিল্লোলে যুবাবৃদ্ধ সকলের শরীর পুলকে নাচিয়া উঠিতেছে। সকল দিকেই আনন্দ! কাননে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া অতিমাত্র সুন্দর দেখাইতেছে। তাহাদের পরিমললোভে মৌমাছি ঝাঁকে ঝাঁকে গুন্‌ গুন্‌ রবে বেড়াইতেছে। নিশাবশানে শিশিরবিন্দু পাতায় পাতায় পড়িয়া ঝক্‌ ঝক করিতেছে। এখন আবার লোহিত রবির স্নিগ্ধ কিরণে এ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দ্বিগুণিত ভাবে বিরাজমান। মুসলমান বালকবালিকারা কোরাণ খুলিয়া মক্তবে বসিয়াছে, তার সুললিত তানে কোন্‌ গোড়মুখীর শক্ত হৃদয় না গলিত হয়! মক্তবের ওস্তাদ পৃষ্ঠদেশ রৌদ্রমুখী করিয়া দিয়া সূচীকর্ম্মে নিয়োজিত, আর মধ্যে মধ্যে ছেলেরা গোলমাল করিয়াছে বা পাঠে অমনোযোগী অনুমান করিয়া নিরপরাধ বা অত্যন্ত

অমনোযোগী বালকের উপরে ভ্রূকুটি-বাণ নিক্ষেপ করিতেছেন। গো-পাল হাম্বা হাম্বা রবে পুচ্ছ তুলিয়া মাঠের দিকে ধাবিত হইয়াছে। কৃষকগণ ক্ষেতের কাজ করিবার জন্য তাহাদের পশ্চাৎ তাড়াতাড়ি চলিয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে, সকল দিকেই আনন্দ, কেহই অলসতা-প্রসূত যন্ত্রণা-ভরে নিপীড়িত নহে। যে যার কাজে ব্যস্ত, যে মহাপাতকী, দুঃখী, সেও সমস্ত রাত্রি নিদ্রার মোহে দুঃখ-তাপ সব ভুলিয়া গিয়াছে, এখন দিবা সুখী। প্রকৃতির এ সুন্দর হাস্যচ্ছটা আমাদের ধর্ম্ম-প্রাণ কাজি সাহেবের গায়ে লাগিয়া ঝলসিয়া উঠিলে তিনিও শয়ন-গৃহের বারান্দায় বসিয়া অজিফা পাঠ করিতে লাগিলেন; আর ছালেমা নিকটে উপবেশন করিয়া তাহার নির্দ্দিষ্ট পাঠ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিয়া দিল। এমন সময়ে কে একজন বরাবর বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিয়া খুব বিনয়ের সহিত আদব কায়দার চরম সীমা বজায় রাখিয়া ডাকিল, "কাজীর-পো, বাড়ী আছেন? কাজীর-পো বাড়ী আছেন ত যে?" দুর্ভাগ্য বশতঃ এ ডাক উত্তর দেওয়ার উপযোগী কাহারও কাণে না পঁহুছিয়া কাজী সাহেবের বিবির কাণে বাজিল। তিনি কিন্তু তাহার কোন উত্তর দেন নাই। এদিকে কেহই সাঁড়া দিতেছে না দেখিয়া অগত্যা লোকটী ঘরের মেজে যাইয়া চৌকির উপর উপবেশন করিয়া কি যেন ভাবিতেছে। বিবি সাহেবা গরম চার পেয়ালা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতেই একজন লোককে গৃহে উপবিষ্ট দেখিয়া অন্য দ্বার দিয়া কাজি সাহেবকে চার পেয়ালা দিয়া আসিতে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে লোকটীর আগমন সংবাদও তাহার গোচর করিলেন। অনতিবিলম্বে কাজী সাহেব অজিফা বন্ধ করিয়া গৃহে যাইয়া দেখিলেন, জমাদারের ছেলে লানতুল্লায় গৃহ-শিক্ষক বসিয়া আছেন। কাজী সাহেবকে দেখিয়া তিনি দাঁড়াইয়া ছালাম করিলেন। কাজী সাহেব

তাহাকে যথোচিত আদর আপ্যায়ন দেখাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্রই আর একটি চার পেয়ালা ও খানিক বিস্কুট হাতে তথায় উপস্থিত হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ বিবী-সাহেবাও পানদান হস্তে তথায় আসিয়া দাঁড়াইলেন, গৃহ-শিক্ষক বিবী সাহেবাকে কদমবুচি করিয়া সোজা হইয়া দাঁড়াইলেই তিনি বলিলেন, ‘আমার বাবা নাকি একা একা বসে আছে? পাঁচ-সাত বছর পর দেখা. সব ভুলে গেছি। চেহারাও ত তোমার কেমন কেমন হয়ে গেছে! ছালেমা. তোর ভাইছাপকে ছালাম কর।’ অমনি ছালেমা দৌড়িয়া আসিয়া ছালাম করিয়া তাহার ভাই সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, “ভাইছাব. খালা আম্মা কেমন আছেন? বড় বুবু এখন কোন খানে আছে, তিনি আমায় তারামালা পাঠিয়ে দিয়েছেন?” ছালেমা তাহার আম্মার সহিত অনেক বার তাহার খালার বাড়ী গিয়াছে। জমাদার-বাড়ীর গৃহ-শিক্ষক তাহার খালাত ভাই, সে তাহাকে ছোট কাল হইতেই ‘ভাইছাব’ বলিয়া ডাকে। তাহার 'ভাইছাবের' এক ভগ্নীর বিবাহ উপলক্ষে সে তাহার মাতার সহিত তথায় গিয়াছিল। কন্যার কণ্ঠে গোপহার সজ্জিত দেখিয়া উহা তাহার নিজের গলায় পরিধান করিবার জন্য কাঁদিতেছিল। সরলা বালিকা, এখনও বিবাহ-রহস্য উদ্ঘাটন করিতে পারে নাই। তাই যা’তা’ বলিতে দ্বিধাবোধ করে না। তাহার মাতা তাকে বলিয়া দিল যে, ‘বিবাহের লগ্ন চলিয়া গেলে, দুই দিন পরেই তোর বুবু তোকে তারামালা পাঠিয়ে দিবে; এখন বাড়াবাড়ি করিস্ নে। ও যে 'বিয়ের দিন বদ্লান যায় না”। তাই সে আজ জমাদার বাড়ীর শিক্ষককে এতগুলি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া ফেলিল। পাঠক, সহজেই অনুমান করিতে পারিয়াছেন যে, ছালেমার খালাত ভাইটীই লালবুল্লার গৃহ-শিক্ষক। এমন সময়ে বাহিরের দিক হইতে স্ফীতোদর বহন করিয়া

কে যেন আসিতেছে দেখিয়া কাজী সাহেবের ইঙ্গিতে বিবী সাহেবা ছালেমাকে ডাকিয়া অন্দরে লইয়া গেলেন। বালিকা স্বীয় প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইয়া কি লিখিতেছে, এমন সময় বুঝিতে পারিল কে একজন নূতন লোক ঘরে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষণেক পরেই তাহাদের ভিতর নানা প্রকার আলাপ চলিতে লাগিল। আগন্তুকের আলাপ শুনিবার জন্য বিবী সাহেবাও ছালেমার প্রকোষ্ঠে যাইয়া কান পাতিয়া বসিয়াছেন। গৃহ-শিক্ষক কাজী সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "খালুজী, আপনার দরগায় বেড়াইতে চাই?"

কাজী সাহেব—তা'ত দেখছিই! আত্মীয় হয়েছ বেড়াবার জন্যই, না বেড়াইলে আর আত্মীয় কিসের?

গৃহ শিক্ষক—কেবল আমি একা নই। আরও লোক সহ।

কা—সা—(আগন্তুক স্ফীতোদরের প্রতি লক্ষ্য করিয়া) আমরা খোসনসিব, গরীবের প্রতি মেহেরবানী। আমরা ফকীরা লোক আর তানরা কিনা লাখী, 'কিসে আর কিসে—নাইল্যার শাকে আর ঘিয়ে'!

কাজী সাহেবের শেষ আলাপটী শুনিয়া বিবী সাহেবা হাস্যরসে আপ্লুত হইয়া কণ্ঠস্ফীত করিয়া বায়স চীৎকারে বলিলেন, "বিহ্, আমার বোনপুত্ বিয়ার ঘটকালী করে নিকি?" শ্রবণ মাত্র কাজী সাহেব গৃহশিক্ষককে লইয়া পশ্চাৎ বারন্দার প্রকোষ্ঠে বিবী সাহেবার সহিত সম্মিলিত হইলেন এবং ছালেমার বিবাহ সম্বন্ধে আস্তে আস্তে আলাপ করিতে লাগিলেন। বিবী সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ছেলেটা কেমন?' বলিতে না বলিতেই গৃহ শিক্ষক বলিয়া ফেলিলেন, "এত আর ঘরে রাখবার জিনিষ নয়! হাটে ঘাটে বরাবরই দেখা যায়, সুন্দর, অত্যন্ত সুশ্রী, আমার নিকটেই পড়িতেছে, আর লেখা পড়া

সম্বন্ধে ত খালুজী নিজেই জানেন।"

গৃহ-শিক্ষকের, 'সুন্দর, অত্যন্ত সুশ্রী,' কথা গুলি শুনিবা মাত্র বালিকার মনে কি এক গোপনীয় কথা যেন জাগিয়া উঠিয়াছে। সে অমনি ব্যগ্র-ভাবে তাহার নিজস্ব বিস্তৃত দর্পণখানা টানিয়া হাতে লইয়া পলকশূন্যনেত্রে চাহিয়া রহিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহার সেই বরণীয় সুন্দর চেহারাটা আজ আর দর্পণে দেখিতে না পাইয়া মাথা নাড়িয়া নীরব ভাষায় অসম্মতি জানাইতেছে। এদিকে কাজী সাহেবও গৃহ-শিক্ষকের উত্তরের প্রতিবাদ করিয়া, 'ছেলে লেখা পড়া ভাল জানে না' একথা বলিতে সঙ্কোচ করিতেছিলেন। স্বয়ং শিক্ষকের সাক্ষাতে ছাত্রের অপ্রশংসা তিনি প্রায়ই ভালবাসেন না। কিন্তু সত্য কথা বলিবেন কি, না বলিবেন, বলা উচিত, কি অনুচিত, তাহা স্থির করিবার জন্য ঘটনাক্রমে ছালেমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া জড়পদার্থের মত দাঁড়াইয়া আছেন। আর যেই বালিকা অসম্মতি সূচক মস্তক-সঞ্চালন দ্বারা দর্পণের অভ্যন্তরে তাহার সেই সুন্দর বরেণ্য ছবির অভাব প্রকাশ করিল, কাজী সাহেবও সেই মুহূর্ত্তে সহানুভূতিসূচক মস্তক সঞ্চালন দ্বারা "ছেলে লেখা পড়া ভাল জানে না" প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। এখন এক জনের মতের বিরুদ্ধে 'না' বলিয়া, কর্ত্তব্য সমাধা করিতে হইয়াছে বলিয়া কাজী সাহেব বিরক্ত ও লজ্জিত হইয়া সেই স্থান হইতে অন্যত্র সরিয়া পড়িলেন। গৃহ-শিক্ষক হতাশ হইয়া প্রত্যাগমন করিতেছেন দেখিয়া বিবী সাহেবা জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন, বাবা, কি কথার উত্তরে যাইতেছ ?"

গৃহ-শিক্ষক—কেন ! তিনি একেবারে মাথা নাড়িয়া না বলিয়া চলিয়া গেলেন যে।

বিবী সাহেবা—আরে, তা ত নয় ! লেখা পড়া জানে না সে কথায়

'না' বলিয়াছে। উনি একটা বর্ব্বর লোক, চালাকী চতুরতা ক'রে যে দু'একটা মিছা কথা বলা তাও জানেন না। বাবা, তুমি তাতে মন ধ'র না।

গৃ—শি।—তবে খোদার ফজলে সম্বন্ধ হবে ত?

বি—সা।--সম্বন্ধ-বাদ হওয়া খোদার হুকুম। আমরা ত অস্বীকার করতে পারি না। তবে কিনা—।

গৃ—শি।—তা বুঝাইয়া বলতে হবে না। হয় এ দিক, নয় সে দিক। লোকটা ত কি রকম প্রতিপত্তিশালী এবং টাকাওয়ালা জানেন? কোটীপতি আর কি। স্বয়ং নিজ মুখেই তিনি সে দিন এক থলিয়ার কথা স্বীকার করেছেন। আর চাই কি?

বি—সা।—তা' বাবা, তুমি যেভাবে হউক আমার ঋণমুক্ত কইরে দিবা, আর বেশী কিছু চাই না। তাইন অমত হতে পারে, তা আমি শোধরাইয়া নেব। বেশী আর কি?—মাত্র একটা ভ্রূকুটির দরকার। ঋণের দায় মাথায় রেখে কি ছেলে পেলেকে আমার পথের কাঙ্গাল কর্‌ব নাকি!

বিবাহ প্রস্তাব যখন এই অবস্থায় উপনীত, তখন গৃহশিক্ষক ঝনাৎ করিয়া কোম্পানীর ১০০৲ শত টাকা বিবী সাহেবার সম্মুখে ফেলিয়া আগন্তুক ক্ষীতোদরের ছালাম জানাইলেন। যাইবার সময়, শীঘ্রই আবার এসম্বন্ধে আলোচনা করা হইবে একথাও বলিয়া যাইতে ভুলেন নাই।

বিবাহের আলাপ করা হইয়াছে অবধিই কাজী সাহেব জমাদারের কোন লোক, এমন কি সে বাড়ীর কাহাকে দেখিতে ঘৃণাবোধ করেন। তাই তথা হইতে এক্ষণে সরিয়া কোথায় গিয়াছিলেন। এখন তাহারা চলিয়া গিয়াছে বুঝিতে পারিয়া গৃহে আসিয়া বসিয়াছেন। বিবী

সাহেবাও ইতঃপূর্ব্বের ছালামী টাকার অভিমানে খুব মোটা হইয়া বসিয়াছিলেন। কাজী সাহেবকে ঘরে উপবিষ্ট পাইয়াই এ-সে আলাপ আরম্ভ করিয়া বলিলেন, "বাড়ী ঘর ত যাওয়ার যোগাড় হ'ল!"

কাজী-সাহেব।—যায় যাবে, তাই বলিয়া মেয়ে সাগরে ভাসাইয়ে দিব নিকি?

বি—সা।—এত ফুটানী ভাল না। তোমার বংশ আর তারার বংশ ত সমানই, তবে আমার বংশ রক্ষার জন্ত পের্‌থম্ কথা বলিতেই ১০০৲ টাকা ছালামী দিয়াছে।

কা—সা।—বংশ বিচার কর্‌তে চাই না, কুলের কোন মূল্য নাই; সকলেই এক আদম হতে এসেছি। 'তবে তুমি ছোট আমি বড়,' একথার অর্থ কি? এসব ইত্‌রামী ছেড়ে দিলেই বাঁচি। আমি বলি—

"আচার, বিনয়, নিষ্ঠা, বিদ্যা অর্জ্জন,
বস্ত্র, বপু, বাক্য, প্রতিষ্ঠা, তীর্থদর্শন।
এই নবগুণ যার থাকে বিদ্যমান,
সেই জন হইবে কুলীনের সন্তান।"

বি—সা।—(রাগিয়া উঠিয়া) কি! এত বড় আস্পর্দ্ধা, 'আমি ছোট, তুমি বড়'! কথা উল্‌টাইয়া বল কেন? 'আমি বড়, তুমি ছোট', আমার আব্বাজান্ স্কান্দর মীরও যে, আর তোমার বাপ্ আবদুল জলিল কাজীও কিনা সে!

কা—সা।—থাক্, আমি সুদখোরের নিকট মেয়ে বিবাহ দিব না।

বি—সা।—'দিবানা,' তোমার কাছে জিজ্ঞাসার বাকী থাক্‌বে? সুদ খাইলে কি হয়? এ ত আর চুরি নয়! আর তোমার যে মুট-মারা পেষা তা আর খারাপ নয়!!

কাজী সাহেব যদিও মুখে মুখে স্ত্রীর কথার প্রত্যুত্তর দিয়া আসিতে-

ছিলেন, তথাপি তাঁহার মনে মনে চিন্তা হইতেছিল যে, স্ত্রী সহজে বশ হইবার নহে। যে কথা একবার তিনি বলিয়াছেন, তাহা হইতে ফিরাইতে হাতে পায়ে না ধরিলে আর রক্ষা নাই। এ অভিজ্ঞতা কাজী সাহেব অনেক দিন পূর্ব্ব হইতে লাভ করিয়া আসিয়াছেন। তাই তিনি 'সুদ খাইলে কি হয়?'—এ কথার যুক্তিপূর্ণ উত্তর স্বীয় স্ত্রীকে সুন্দররূপে বুঝাইয়া দিবেন স্থির করিয়া নিজ কর্ত্তব্য কর্ম্মে চলিয়া গেলেন। সম্প্রতি দাম্পত্য বাক্যুদ্ধ স্থগিত রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

বিমাতার নির্ম্মম ব্যবহার।

যে অঞ্চলের কথা বলা হইতেছে তাহা একটা পাহাড়ে স্থান। হাট, বাজার, দোকান-পাটের বিশেষ কোন সুবিধা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। গ্রাম্য লোকের এ অসুবিধা দূরীকরণার্থ গ্রামের ভিতর স্থানে স্থানে বেণে-দোকান বসান আছে। সাধারণতঃ হিন্দু-বিধবারাই এই সকল দোকানে ক্রয় বিক্রয় করিয়া থাকে। মুসলমান বৃদ্ধা বিধবারাও পর্দ্দার ভয়ে এ সুবিধাটুকু উপভোগে বঞ্চিতা। এই দোকানের মালিকেরা মাঝে মাঝে নিকটবর্ত্তী লোকালয়ে দোকান-ফিরি করিয়াও বেড়ায়। এ রকম দোকান-ফিরিতে কি পরিমাণ লাভ, তাহা এরূপ দোকানদার বিধবাদের পোষাক-পরিচ্ছদের এসেন্স্ নাকে টানিয়াই অনুমান করা যায়। অবশ্য যাহারা ফিরি করে না, তাহাদের লাভটা কথঞ্চিৎ কম। ফিরিওয়ালা এক বেণে-বিধবার সহায়তায় আমাদের বিবী-সাহেবা তাহার দুরভিসন্ধির অবতারণা আরম্ভ করিয়া দিলেন। এক, দুই করিয়া তিনি জমাদার, গৃহ-শিক্ষক ও লালতুল্লা, সকলকেই তাহার মত জ্ঞাপন করাইয়াছেন। অহরহ ষড়যন্ত্রকারীদের ভিতর কু-মন্ত্রণার আদান-প্রদান হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে জমাদার বাড়ীর গৃহ-শিক্ষকও গুপ্তভাবে আসিয়া বিবী-সাহেবাকে নানা প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া গিয়াছেন। এই মাতৃহীনা মেয়েটাকে যা' তা' করে একটা বিবাহ দিয়া আরও কতকগুলি টাকা সংগ্রহ না করা কতটুকু বোকামী, তাহাও তিনি বুঝাইয়া দিয়াছেন। আরও বলিয়াছেন যে,

সম্প্রতি যে ১৫০০৲ পনের শত টাকার নালিশ, তাহা পরিশোধ করিতে না পারিলে তাঁহার স্বীয় গর্ভজাত স্নেহের পুত্র কন্যা তাহার চোকের উপর অনাহারে ও অনশনে প্রাণত্যাগ করিবে, তাহা সহ্য হইবে কি? আর বিশেষতঃ এ মেয়েটা যেরূপ ভাবে লানতুল্লার মত লোকের চোকে পড়িয়াছে, তাহাতে ছাড়াছাড়ি কিছুতেই হইবে না। যে কোনও নৃশংস উপায়ে হউক, ইহাকে সে মাণিক আত্মস্যাৎ করিবেই। গৃহ-শিক্ষকের এবম্বিধ নরম-গরম কথা শুনিয়া বিবী-সাহেবা সজোরে হাতের চূড়ী নাড়িয়া বলিলেন, "বাবা, তুমি বংশের বাতি; তোম্‌কেই আমাদের ইজ্জত-হুর্‌মত রক্ষা কর্‌তে হবে। তোমার মত এত বড় বিদ্যান আমাদের বংশে আর কে-ই বা আছে? তবে প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা করে বলি, তোমার দিক তুমি ঠিক রাখিও, আমি একাই জোরে-জবরে ছলে বা কৌশলে দাসীর ঝিকে বাড়ীর বাহির কর্‌বো"। এই কথা শুনিয়া গৃহশিক্ষক অমনি পকেট হইতে আরও ১০০৲ শত টাকা বিবী-সাহেবার সম্মুখে স্থাপন করিয়া লানতুল্লার ছালাম জানাইলেন। বিবী-সাহেবা দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিলেন, "বাবা যাও, আর কোন কথা বল্‌তে হবে না। আকাশ-মার্গ হতে চন্দ্র-সূর্য্য-তারা খসিয়া মাটীতে পড়্‌তে পারে, কিন্তু জানিস্‌ বাবা, এ হতভাগীর কথা নড়্‌ হতে পারে না।" অতঃপর দুজনই সে দিনের জন্য পৃথক হইয়া পড়িলেন। কাজী সাহেব কিন্তু ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে এখনও কিছু জানিতে পারেন নাই। এই কথাই তিনি বিশ্বাস করিয়া বসিয়াছেন যে, শত হইলেও আমার ঘরের লোক; একটু বুঝাইয়া-সুজাইয়া বল্লেই ঠিক হইয়া যাবে। 'লানতুল্লার সহিত তাঁহার প্রিয় কন্যা ছালেমার বিবাহ'—ইহা যে একটা কথা, এই কথাই তিনি বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু এ দিকে যে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপিনী প্রেয়সী পত্নী, রাক্ষসী সাজিয়া বসিয়াছেন,

তাহা কল্পনা করাও তাঁহার পক্ষে যন্ত্রণা-দায়ক হইয়াছে। তিনি মনে করিয়াছিলেন, না হউক তাঁহার গর্ভজাত কন্যা, মেয়েটী সর্ব্বদাই 'আম্মা, আম্মা' বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে, তাহার দৈনন্দিন কর্ত্তব্যের সাহায্য করে কখনও সৎ-মা বলিয়া জানে না, ভক্তি-আবদারও ত কোন অংশে কম দেখাইতেছে না। তবে কেন মেয়েটীকে জীবন্ত কবরে প্রোথিত করিতে ইচ্ছা করিবে? যখন অই চন্দ্রবদনে মধুমাখা কথা ফুটিয়াছে, তখন তাহার অপার্থিব মধুরতা কে উপভোগ করিয়াছে? এত কথা স্মরণ করাইয়া দিলেও কি এ পাশবিক একগুয়ে মতের পরিবর্ত্তন হইবে না? নিশ্চয়ই হইবে। একান্ত যদি হিংসাগ্নি সহজে নির্ব্বাপিত না হয় তবে? তবে আর কি করিব? অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধের না হয় বিচ্ছেদ ঘটিবে। বিরহজ্বালা সহ্য করিতে হইবেই। কিন্তু তাহা সহ্য হইবে কি? যদি না হয়, খোদার নিকট আ-কেয়ামত দায়ী থাকিব। কাজেই প্রাণপণ প্রতিজ্ঞা, ধর্ম্মের জন্য অনাথার অনুকূলে উদ্যম চেষ্টার অভাব হইবে না, হওয়া সম্ভবও নয়"। কাজী সাহেব যেমন পরিণয়ের প্রতিকূলে স্থির-প্রতিজ্ঞ, বিবী-সাহেবা তেমনি ইহার অনুকূলে অবিচলিতা। এখন ভাগ্য পরীক্ষায় যাহার জয় হইবে তিনিই জয়ী হইবেন। আর পরাজিত যিনি, তিনি লাঞ্ছিত, ঘৃণিত, অপমানিত, পদদলিত, হয়তঃ ন্যায়ের তেজ-দণ্ডের প্রতিঘাতে সংশোধিত হইতেও বিলম্ব হইবে না।

যাহা হউক, সম্প্রতি ন্যায়ের দল দুর্ব্বল, অন্যায়ের দল খুব শক্তিশালী দেখা যাইতে লাগিল। তদ্দর্শনে কাজী সাহেব কিঞ্চিন্মাত্র বিচলিত হইলেন না; দেখা যাক, দেখা যাক, করিয়া ঘটনা এতদূর দাঁড়াইল যে, বিবী-সাহেবার ষড়যন্ত্রে বাস্তবিক অকস্মাৎ এক দিন কাজী সাহেবের অজ্ঞাতে তাঁহার বাড়ীতে ছালেমার বিবাহ বৈঠক বসিয়া গেল। সে

বিবাহ-বৈঠকে অনেকানেক প্রয়োজনীয় লোক উপস্থিত হন নাই, হইবার সুযোগও দেওয়া হয় নাই। কেবল ছালেমার মাতা. সৎ মামু ও বরপক্ষীয় দুই এক জন লোক দ্বারাই বিবাহের কথাবার্ত্তা শেষ হয়। কাজী সাহেব তাহাতে বড় একটা মনোযোগ দেন নাই। বেগতিক দেখিয়া তখনই তাহার কোন প্রতিবাদ করাও নিরাপদ মনে করেন নাই। নীরব থাকাই সঙ্গত মনে করিয়া লইয়াছিলেন। কেহ যদি তাঁহাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত, তিনি যৎপরোনাস্তি দুঃখের সহিত কেবল এ বলিয়া উত্তর দিতেন, "আমি কিছুই জানি না।" আস্তে আস্তে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল, কাজী সাহেবেরও, অবলা কন্যার অদূর ভবিষ্যত অদৃষ্টের কথা স্মরণ করিয়া, চিত্ত-বিকার উপস্থিত হইল। তিনি যেন আর এ বাড়ীতে আসিতে ইচ্ছা করিতেছেন না। কত কথাই তাঁহার মনে হইতে লাগিল। যে দিন ঘরের স্নেহের ছেলে মেয়ের আধ আধ কথা কর্ণে শীতল জল ঢালিয়া দিত, বোধ হইত তিনি যেন স্বর্গে। সেই এক দিন গিয়াছে, আর আজই এক দিন। কন্যার বিবাহ না তাহার কেয়ামত, তিনি কিছুই যে ঠিক করিতে পারিলেন না। এই মর্ম্মান্তিক বেদনার ভিতরে তখনই কেবল তিনি একটু আনন্দ উপভোগ করেন, যখন দেখেন, বালিকা পূর্ব্ববৎ তাহার বিস্তৃত দর্পণের ভিতর তাকাইয়া তাকাইয়া কোন্ যেন স্বর্গীয় মূর্ত্তির অনুসন্ধান করিতেছে। এই সময় এক দিন তাহার ছোট ভগ্নি ফিরোজা আসিয়া বলিল. 'বুবু' তোমার না সাদি;" ছালেমা উত্তর করিল, "সাদি ত কিছুতেই নয়, বরং আরও দুঃখ"। বালিকার একথা বিবী সাহেবার কর্ণে লাগিয়া কোপানলে ঘৃতাহুতি দিল। বিশেষতঃ তিনি পূর্ব্বেই জমাদারের মাকাল-ফলের আশা করিয়া বসিয়াছিলেন। তিনি জানিতে পারেন নাই যে জমাদার বরাবরই ষোল আনি খাজানা

আদায় করিতে বসিয়া ভুলে সোয়া যোল আনা গণনা করিয়া ফেলেন। আর কাহারও প্রাপ্য পরিশোধ কালে ঐরূপ যোল আনা গণিতে বসিয়া ভুলে পৌনে যোল আনা গণিয়া বসেন। তাই পায়ের পাতায় ভর্ করিয়া তিনি ছালেমাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিলেন। তাহার রাঙ্গা চোকর উদ্ধত স্বভাব এবং ইচ্ছাকৃত অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য দর্শনে বালিকা, দুঃখে, ক্ষোভে, অভিমানে ও লজ্জায় কাঁদিয়া ফেলিল। বিমাতা আবার অকুতোভয়ে গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিলেন, "হারামজাদী, বাপ্ঝি পরামিশর করে আমার সাথে জিদ্ খেল্‌ছ। এত আস্পর্দ্ধা তোর! যেমন গাছ, তেম্‌নি বিনা তার গোটা, তোর মা ত শুনেছি নেহাত্ ছোট লোকের মেয়ে, তুই না হলে ঢেঙ্গাবেটী বিবাহের কথায় এমন সৃষ্টি ছাড়া কথা বল্‌বি কেন?"

বিমাতার নির্ম্মম ব্যবহারে এবং স্বীয় স্বর্গীয় মাতার দুর্ণাম শুনিয়া বালিকা মাথা গুজাইয়া কাঁদিতে লাগিল। কাঁদ বালিকে, কাঁদিবার অভ্যাস কর। আদুরে পিতার মেয়ে, এখনও কাঁদিতে শিখনি, তাই কাঁদিতে শিখ। তোমাকে আরও ঢের কাঁদিতে হইবে,। বিশাল অনন্ত মাঝে কান্নার অক্ষয় ভাণ্ডার তোমার জন্য প্রস্তুত। এখনও সহ্য কর, সহিষ্ণুতাই তোমার এ দুঃখের অবলম্বন। তাই সমবেদনা জানাইয়া বলিতেছি, দুঃখ-জীবনের এ মাত্র প্রারম্ভ; এখনই অসহিষ্ণু, আকুল, অস্থির হইলে চলিবে কেন? যদি স্থির ধীর ভাবে সহ্য করিতে পার, তবে অচিরেই রমণী-রাজ্যের রাণী হইবে সন্দেহ নাই। যখন আশা পূর্ণ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে ক্লেশ-যাতনা-লব্ধ ভালবাসা বক্ষে কত মোলায়েম্!

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

আদর্শ আলেম।

সন্ধ্যাকাল। কাজী-পরিবারের সকলেই আজ তাড়াতাড়ি পান-ভোজন সমাধা করিয়া অবসরপ্রাপ্ত হইতেছে। এক-এক করিয়া লোক বাহির-বাটীর আঙ্গিনাতে শস্প-শয্যায় উপবেশন করিতেছে। তার পশ্চাৎও যথেষ্ট লোক স্তুপাকারে জমাট হইতে লাগিল। সর্ব্বত্রই হর্‌দম কাণাকাণি, ফুস্‌ফুসানি চলিতেছে। কিন্তু এখনও প্রকাশ করিয়া কেহই কিছু বলিতেছে না। এমন কি, আস্তে আস্তে চতুষ্পার্শস্থ লোকালয় হইতেও দুই একজন করিয়া জনতায় যোগদান করিয়া তাহার কলেবর যথাসম্ভব বৃদ্ধি করিতে লাগিল। এতক্ষণে আঙ্গিনা এমন ভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল যে আর একটি লোকও সুগম রাস্তা ধরিয়া ঐ বিপুল জন-সংঘের ভিতর প্রবেশ লাভ করিতে পারিবে না। কেবল একে অন্যকে ধাক্কাইয়া তাহার বন্ধুর সহায়তা করিতেছে। আবার কেহ কেহ এরি মধ্যে নিজের বাগ্‌দবি দেখাইবার জন্য হস্ত পদ ছড়াইয়া চতুষ্পদ জন্তুর মত একাই দুই তিন জনের স্থান দখল করিয়া কপাল-কুঞ্চিত করিয়া বসিয়া আছে। এমন সময়ে, অশ্বপৃষ্ঠে উপবিষ্ট একজন প্রবীণ লোক ১০।১২ জন অনুচর সহ, জক্‌সকের সহিত তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার আ-বক্ষ-প্রলম্বিত শ্মশ্রু তুষারবৎ শুভ্র, এবং আপাদ-মস্তক কাল চক্‌চকে আল্‌পাকার চাপকান্ ও পাজামা পরিহিত। কিন্তু এ-বুড়া বয়সেও মাথায় অবর্ণনীয় কারুকার্য্য-খচিত আরবী পাগ্‌ড়ী

স্থাপন করায় যেন স্বর্গীয় সুষমা অঙ্গে অঙ্গে মাখিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহার অমায়িক ভাবে ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে যে কোন লোকের, পায়ে পড়িয়া ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতে ইচ্ছা হয়। তাই ধপ্ ধপ্ করিয়া একাধিক স্থানে সমবেত জনমণ্ডলী আগন্তুককে কদমবুছি করিল এবং প্রায় সকলেই, "মাওলানাছাব আস্ছেন, মাওলানাছাব্ তস্রিফ্ লিছেন্" ইত্যাদি বলিয়া কুর্ণিশ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে কাজী সাহেবও জানিতে পারিলেন যে, মাওলানা সাহেব এইমাত্র আসিয়াছেন। তিনি দৌড়িয়া অন্দর হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহার সহিত ইস্লামের প্রধান সৌভ্রাতৃত্ব-স্থাপক করমর্দ্দন করিয়া যথেষ্ট আপ্যায়ন দেখাইলেন। মাওলানা সাহেবও অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত এক আলিঙ্গন দিয়া যেন কোনও কালের ভালবাসার প্রতিদান করিলেন।

বলা বাহুল্য যে, কাজী সাহেব ও আগন্তুক মাওলানা সাহেব পরম সুহৃদ্। তাঁহারা বাল্যকালে এক সঙ্গে আরবী পার্শি ভাষা অধ্যয়ন করিতেন। ধর্ম্ম ভাষায় সাধারণ জ্ঞান হইলেই কাজী সাহেবকে তাঁহার পিতা বাল্য-বিবাহের অপক্ক-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া দেন। এই বাল্য-পরিণয়ই কোনও প্রকারে কাজী সাহেবের শিক্ষা-জীবনের অন্তরায় হইয়া উঠে। আর আবদুলকদ্দুছ স্বদেশে জমাতেউলা পাশ করিয়া ম্যাট্রিকুলেশন শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন এবং প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করিয়া হিন্দুস্থান চলিয়া যান। তথাকার এক প্রসিদ্ধ শিক্ষাশ্রম অবলম্বন করিয়া তিনি একাধারে ১০ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া হাদিস্, তপ্ছির্, এজ্মা, কেয়াস্ প্রভৃতিতে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া দু'দশ গ্রামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আলেম বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। দেশে আসিয়াছেন অবধিই লোকে তাঁহাকে 'মাওলানা সাহেব' বলিয়া ডাকে। এখন তিনি ধর্ম্মরাজ্যের নেতা। নানাবিধ কুসংস্কার, অথবা ধর্ম্মহানিকর যে

কোন বহুদিন-প্রচলিত সমাজরীতি তিনি অকপটে ও অবলীলাক্রমে দূরীভূত করিয়া দিতেছেন। খোদা তাঁহাকে যেন ভগবৎ অনুপ্রেরণায় ভরপূর করিয়া রাখিয়াছেন, তিনি যে মজ্‌লিসে ওয়াজ করিবার জন্য দণ্ডায়মান হয়েন, তথাকার জনসাধারণের চক্ষে ধর্ম্মভয়ে জল-ধারার সৃষ্টি হয়; কঠিন প্রাণ গলিয়া জল হইয়া যায়। এমন কঠিন প্রাণ নাই, যে তাঁহার যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা ও মধুরালাপে মুগ্ধ ও মোহিত না হইয়াছে। কথায় বলিতে গেলে, তিনি কাহাকেও ছাটা কথায় অন্যায় হইতে বিরত করেন না; যুক্তিতর্কের সাহায্যে যে কোন তার্কিক তাঁহার নিকট হার মানিয়াছে। তাই আবদুর রসিদ কাজী তাঁহার স্ত্রীকে সুদখোর সম্বন্ধে উপদেশ দিবার জন্য তাঁহার প্রিয় বন্ধু মাওলানা আবদুলকদ্দূছ সাহেবকে আজ তাঁহার বাড়ীতে দাওয়াত্‌ করিয়াছেন। কাজী সাহেব. বিবী-সাহেবাকে পর্দ্দার আড়ালে বসিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া মাওলানা সাহেবকে ওয়াজ করিতে বলিলেন। তিনি অমনি দাঁড়াইয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—"হে ভাই মোছলমান! মাছ্‌ গোস্‌ত্‌ খাইয়া মাথায় টুপী পরিধান করিলেই আমরা খাঁটী মুছলমান হইতে পারি না। ইস্‌লামের ভিতরে কি মধুরতা নিহিত তাহা প্রকৃত মোস্‌লেম ব্যতীত আর বুঝিবে কে? ইস্‌লাম 'সল্‌ম্‌' অর্থাৎ 'শান্তি' নিয়াই দুনিয়ায় আসিয়াছে, সামাজিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক, জাগতিক এবং দৈহিক সর্ব্ববিষয়ে সে কেবল শান্তিই বিধান করিয়া থাকে। শান্তিই তাহার প্রাণ, শান্তিই তাহার কর্ত্তব্য, শান্তিই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য। ইস্‌লামের অস্তিত্বের মিটিমিটি আলো লইয়া বহু শাখা প্রশাখা পৃথিবী ছাইয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু সে শাখা-প্রশাখা-সমূহ আপাততঃ স্থূলদর্শীদের নিকট তাহার সহিত সম্বন্ধ-রহিত বলিয়া অথবা তাহার চরম লক্ষ্য—শান্তিবিধানবিবর্জ্জিত বলিয়াই অনুমিত হয়—হওয়ার কথাও।

উৎপথবর্ত্তী-তরণী যেমন স্বীয় বহর হইতে অতি দূরে থাকিয়া, উহার গন্তব্য-স্থান অথবা কর্ত্তব্য-ভার অতিমাত্র অক্লেশে বেলাভূমিতে ক্রীড়া-মুগ্ধ বালক-দর্শকের হৃদয়ে জাগাইয়া দিতে অক্ষম ; পরন্তু নানা প্রকার উদাসীনতা ও উশৃঙ্খলতার ক্ষীণরেখা হৃদ্বিপটে অঙ্কিত করিয়া দেয়, কিন্তু যে অতঃপর-পারদর্শী সাগর-পরিব্রাজক একাধিকবার অতল-জলধির উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ-সাগরপৃষ্ঠে হাবু-ডুবু খাইয়াছে, তিনি কৃপা-কটাক্ষে যেমন এরূপ বহরচ্যুত তরণীর আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাহাকে বিপদ-মুক্ত করেন, তেমনি সূক্ষ্মদর্শী তত্ত্ব-জ্ঞানীদের নিকট ইসলামের জীবনের ভিতরে ও বাহিরে, কথায় ও চিন্তায়, সর্ব্বদিকেই—চরম লক্ষ্য একমাত্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করারই অশেষবিধ বিধি-ব্যবস্থা স্পষ্ট ভাবে অনুভূত হইবে। এই অনুভূতি কৃত্রিম নহে, কল্পিত নহে; ইহা বিশ্বপ্রেমিক শান্তিদাতার শান্তি বিধানের একটা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণা মাত্র। বুঝিয়া দেখ প্রকৃত মোস্‌লেম, হৃদয়ের প্রতি একবার তাকাও, দেখিবে অথবা বুঝিবে মাত্র, ইস্‌লামই সত্য। তুমিই তার সাক্ষী। ন্যায়ের চশমা পরিধান করিলে অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বীও তাহা দেখিতে পাইবেন।

"বিপদের ঘনঘটায়, আনন্দের উচ্ছ্বাসে ইস্‌লাম-বীণার শত-তার ঝঙ্কারিয়া কেবল শান্তিরই আহ্বান করিয়া থাকে। ইস্‌লাম 'না' বলিয়া কখনও তাহার নমনীয় মাধুর্য্যের বিনাশ সাধন করে না ; দর্শন-বিজ্ঞান, ন্যায়শাস্ত্র ইত্যাদি স্বীয় বাধ্যবাধকতার গণ্ডির ভিতরে থাকিয়া ইস্‌লামকে ন্যায়ান্যায় আদেশে সুকৌশলে 'হাঁ' বলিয়া সম্মতি ও অসম্মতি জানাইবার ব্যবস্থা শিক্ষা দিতেছে। অথচ ইস্‌লাম ন্যায় পথ হইতে ইঞ্চি পরিমাণও সরিয়া থাকিতে জানে না। ইস্‌লামের এই রহস্যদ্বার উদ্‌ঘাটন করা সহজ ব্যাপার নহে! প্রকৃত ভাবুক

ঈশদানের যোগ্য হইতে পারিলে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাহার আভাস পাইবে মাত্র। ঐকান্তিক ভক্তিমিশ্রিত আরাধনা, নিঃস্বার্থ ত্যাগস্বীকার এবং জীবনের অধ্যায়ে অধ্যায়ে বাস্তবিকতা দ্বারা তাহা প্রতিফলিত না হইলে ইস্‌লামের রহস্যভেদ অসম্ভব। ইস্‌লাম-বীণার অসংখ্য তার ঝঙ্কার করিয়া অসংখ্য জাতিভেদ, উচ্চনীচতা অথবা নানা প্রকার অসামঞ্জস্যকে নির্ম্মল আকাশের সঙ্গে বিলীন করিয়া দিতে চায়। তাহাতে সৌভ্রাত্র স্থাপিত হইতে পারিলে জাগতিক শান্তি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে পারলৌকিক মুক্তির পথ বাস্তবিক সুগম হইয়া উঠে। পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতির সংযোগকে ইস্‌লাম এত অবিচ্ছেদ্য করিয়া রাখিয়াছে যে, একটী অপরটীকে ছাড়িয়া এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না। প্রথমতঃ, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ না করিলে মানুষ আধ্যাত্মিক উন্নতির কল্পনাও করিতে পারে না। পৃথিবী ও স্বর্গের মধ্যে ইহাই সর্ব্বপ্রথম সম্বন্ধ। পৃথিবী পরিশ্রম ও কর্ম্মস্থল; স্বর্গ তৎপ্রতিদানে উপভোগ ও বিশ্রামাগার। দৈহিক উন্নতি হইলে মানসিক উন্নতি সংসাধিত হয়। মানসিক উন্নতি ব্যতীত আরাধনা, ভালমন্দ বিবেচনা এবং পরিশেষে আধ্যাত্মিক উন্নতি একেবারেই অসম্ভব। দুনিয়ার সহিত আখেরাতের, শরীরের সহিত মনের, এবং মনের সহিত মুক্তির এই অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ শিক্ষা দিয়া ইস্‌লাম কি এক অনুপমেয় নির্ভরতা ও একতা শিক্ষা দিতেছে! যেখানে একতা, যেখানে নির্ভরতা নির্ব্বিঘ্নে বিরাজ করিতে পায়, সেখানে মতভেদ নাই, বাক্যের উচ্চনীচ প্রহার নাই, হিংসা বিদ্বেষ নাই, কেবল নীরবতা ও বাধ্যতা নিস্তব্ধ ভাবে রাজত্ব করিবার অধিকার পায়। তবে ইহা শান্তি নয় আর কি হইতে পারে?"

(এখন পার্শ্বস্থ পর্দ্দারদিকে ফিরিয়া)—

"মা, ভগিনীগণ, মোস্‌লেম হইয়া এই শান্তিভঙ্গের কারণ তোমরা হইলে, সুখের এই সংসার তোমাদের করুণ আর্ত্তনাদের বাসরগৃহে পরিণত হইবে; পরজগতের কথা না হয় একটু পরে বলিব। আমরা মানুষমাত্র দুর্ব্বল, ভবিষ্যত সম্বন্ধে কোন জ্ঞান নাই, তাই ভবিষ্যৎটা বুঝিতে অক্ষম হইয়া কেবল কর্ত্তব্য করিয়া যাই এবং আমাদের কৃতকর্ম্মের সুফল লাভের জন্য অহরহ খোদাকে স্মরণ করি। এই খোদা স্মরণই নির্ভরতার গুণ। তাই আমরাও, 'আল্লাহুর প্রতি নির্ভর কর' এই খোদা-বাণীর অনুসরণ করিয়া থাকি। এমন কোন কাজ খোদা আমাদের কর্ত্তব্য করিয়া দেন নাই, যাহাতে খোদাস্মরণের প্রয়োজন নাই। যদি এমন কোনও কাজ পৃথিবীতে থাকে, তবে তাহাই ভণ্ডামি, তাহাই শেরেকী, তাহাই সৃষ্টিকর্ত্তার নিষেধ। সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য তিনি আমাদিগকে নানা প্রকার কার্য্যপ্রণালী দিয়াছেন। ব্যবসাই বল, আর কৃষিকর্ম্মই বল, আমরা লাভের আকাঙ্খা করিয়া অন্ধকারে হাতড়াইতে থাকি, লাভ হইবে কি ক্ষতি হইবে তাহা বুঝিতে অক্ষম। কেবল খোদা-স্মরণই আমাদের সার। আমরা এখনও বিশেষ কিছু জানি না। কিন্তু আপচোচ্ আত্মাজ্ঞান! 'টাকা লাগাইয়া সুদ গ্রহণ' এমন একটী ব্যবসায়, যাহাতে খোদা-স্মরণ একেবারেই নিষ্প্রয়োজন। এই ব্যবসায়ে হাজা-শুকার বিবেচনা নাই; ইহার নিকট ব্যারাম আজারের করুণ রোদন অগ্রহণীয়, শীতাতপের বিভিন্নতা নাই; কারণ টাকা লাগাইবার দিনই মহাজনের কাণিকড়া পর্য্যন্ত হিসাব পাকা। যতদিন পৃথিবী চলে, টাকার সুদও ততদিন চলিতে বাধ্য। কে তাহাকে বারণ করিতে পারে? তাই বলিতেছিলাম এক্ষেত্রে খোদাস্মরণের

প্রয়োজন নাই ; নির্ভরতার মূল্য নাই। কাজেই সুদখোর লোকেরা, সত্যকথা বলিতে গেলে, একরম দুর্বৃত্ত ও দুরাচার হইয়া উঠে। রোজা নামাজদ্বারা তাহারা খোদাকে বড় একটা সন্তুষ্ট রাখিতে চায় না। এই সম্প্রদায়ের লোকের সঙ্গ ভাল নহে। ইহাদের উদরের পরিধি সাধারণতঃ ৩০ হইতে ৪০ ইঞ্চি পর্য্যন্ত। উদরের তুলনায় হস্তপদাঙ্গ কৃশ এবং চক্ষু দুইটী কোটরগত, দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণা, ও অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির তুলনায় মস্তকের পরিমাণ বড়। ইহারা স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর হইয়া থাকে। খাতকের নিকট হইতে টাকা আদায়ের জন্য তাহারা যে কোন পাশবিক অত্যাচার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে না। মুহূর্ত্তকাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই ইহাদের সজলনেত্র রাগান্ধ হইতে জানে। কাজেই নির্লজ্জভাবে ইয়ার্-কিছিমের লোক হইতেও সোয়া-ষোল আনা টাকা আদায় করিয়া বসে। এই দল লোক খোদার নিকট বড় ঘৃণিত। পরম কারুণিক খোদা, তাই তাহারা বাঁচিয়া আছে, নতুবা খোদার এদুনিয়ায় তাহাদের স্থান হইত না। তাই বলিতেছি, হে ভাই ভগিনীগণ, যদি স্বর্গের সে সুন্দর সুষমা দর্শনে অতৃপ্ত নয়নের তৃপ্তি সাধন করিতে চাও, হায় হায়, যদি বেহেস্তের সেই অতুলনীয় অনন্ত সৌন্দর্য্যে পরিভূষিত বালাখানা, মনোরম উদ্যান বাড়ী, দুগ্ধাধিক শুভ্র নির্ম্মল এবং মধু-হইতে-সহস্রাধিক-গুণ-অধিক সুস্বাদ জলের ফোয়ারা দেখিতে চাও, তবে এখনও সাবধান হও। সময় থাকিতে সাবধান, বিলম্বে হতাশ হইতে হইবে। আর স্মরণ করিয়া রাখ বেহেস্তের সেই অমৃত-সুধা-স্বরূপ মৎস্য-কাবাবের কথা আর কাটাহীন পাকা পাকা কুলের কথা, যার তুলনা ইহ জগতে নাই। আরও স্মরণ করিয়া রাখ, সেই 'হাওজে কওছর'র কথা—পূর্ণমাসীর চন্দ্রালোক দর্শনে চক্ষু ঝল্‌সাইয়া যায়, সে কথা মানি। কিন্তু ইহার স্ফটিকবৎ জল

দর্শনে আরও অধিকতর ভাবে চক্ষু ঝলসাইয়া উঠিবে! নিতান্ত দ্রুতগামী অশ্ব একমাস বিদ্যুৎবেগে ছুটিয়া দৌড়িলে তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইতে সক্ষম হইবে না। যদি সেই 'হাওজে কওছরের' অমৃত জল পান করিয়া হাসরের মাঠে মার্ত্তণ্ডতাপে উত্তপ্ত 'তামার জমীনে' তোমার শুষ্ক তৃষ্ণার উপশম করিতে চাও, তবে সুদখোর হইতে অনেক দূরে থাক। নমাজে, সমাজে, জাগতিক কার্য্য-ব্যবসায়ে তাহার সহিত মিলিত হইয়া তোমার সুখের জীবনকে নিরর্থক করিও না। ইহা খোদার আদেশ, আমি তাঁহার দাসানুদাস: আদেশের আভাস মাত্র প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।"

নমাজের জন্য অমনি বাহিরে আজানের ধ্বনি শ্রুত হইল। সকলেই জমাতে এসার নমাজ পড়িবার জন্য সরল শ্রেণীতে দণ্ডায়মান হইল। নমাজ শেষান্তে মাওলানা সাহেব হাত তুলিয়া "আমিন, আমিন" বলিতে উপদেশ দিয়া মোনাজাত করিলেন, "ইয়া এলাহি, জোল্‌্যসামুহু পাক পর ওয়ারদেগার, ইয়া ইলাহাল্ আল্‌মিন্, করুণাময়, জগতপাতা! এ তব দাসানুদাস, তোমার দরগায় আকাঙ্ক্ষা করিবার উপযুক্ত নহে। তুমি রহ্‌মানুর্‌রহিম, তাই তোমার অফুরন্ত দয়ার ভরসা করিয়া এ পাপিষ্ঠ, নরাধম, নগণ্য বান্দা তোমার অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া হাত উঠাইয়াছি। আমরা পার্থিব কৃত্রিম সুখভোগে রত, প্রকৃত সম্মুখ-বেহেস্তের কথা ভুলিয়া গিয়াছি, পৃথিবীর মায়া-মধু পান করিয়া বিশাল সর্প-বিচ্ছু-পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর কবর-গহ্বরের বিপদসঙ্কুল অবস্থার কথা একেবারে ভুলিয়া আছি। মানুষ আমরা দুর্ব্বল, প্রভু, তুমিই সবল কর, তুমি সবল কর। অজ্ঞান আমরা, প্রান্তরে কান্তারে, মাঠে মস্‌জিদে, পথে ঘাটে গিরি-গুহায় প্রাণান্ত খুঁজিয়া তোমার সন্ধান পাই না; হতাশ হইয়া যখন মাথা ঘুরিতে থাকে তখন চারিদিকেই

কেবল তোমার বিকাশ দেখিতে পাই। জলে স্থলে, রাজপ্রাসাদে বা কাঙ্গাল-কুটীরে, গহন-কাননে যেখানে সেখানে তুমিই সর্ব্বব্যাপী, প্রভু। তোমার দয়া মহান্, তোমার ক্ষমা মহান্. অশেষবিধ অন্যায় করিয়াছি, লোভের মোহে, সয়তানের প্ররোচনায় অনেক করিয়াছি, প্রভু, অনেক করিয়াছি। জানি না দয়াময়, কত নিরপরাধ দুর্ব্বলকে মনে কত কষ্ট দিয়াছি, কত গুরুজনের প্রতি যথোপযুক্ত সদ্ব্যবহার করিতে না পারিয়া মহাপাতকী হইয়াছি। তুমি সহায়, করুণাময়, আমি আর কিছুই জানিনা। তোমার লীলা নশ্বর-মানববুদ্ধির অতিদূরে। দিনে একবার তুমি সকলকে নির্জ্জীব করিয়া তোমার শক্তির জলন্ত উদাহরণ দাও। আমরা তথাপি এ সাময়িক নিদ্রাবলোকনে সে অনন্তব্যাপী মহানিদ্রার কথা-স্মরণ করিতে পারিতেছি না! আর কত সহ্য হইবে, হে সুবিচারক! এ দেহের অবসান হইলে তোমা হইতে যাহা প্রসূত, তোমাতে তাহা মিলাইয়া লইও, ইহাই শেষ নিবেদন, প্রভু। জীবনে মরণে, শয়নে স্বপনে তুমিই প্রভু, সহায়। শক্তি-সামর্থ্য সব প্রভু, তোমারই পায়ে বিলাইয়া দিয়াছি, তাহা ত তোমার নিকট অবিদিত নহে।' (অপেক্ষাকৃত উচ্চরবে)—হে খোদা, যে অবোধ বান্দা তোমার, সয়তানের ফেরেবে পড়িয়া অসৎসঙ্গ তালাস করিয়া বিপদ ডাকিয়া আনিতেছে, তুমি তাহার অন্তরে অনুভূতি দিয়া তোমার দয়ার পরিচয় দাও। যে পাপী হতভাগারা তোমার আদেশ অনুযায়ী রোজা নামাজ সম্পন্ন করিতেছে না, বরং নানা প্রকার অবৈধ কর্ম্মে অহরহ নিযুক্ত, তাহাদিগকে তুমি সংশোধন কর। বেনমাজী, রিয়াকারী, ব্যভিচারী ইত্যাদি পাপাত্মারা তোমার দয়া ব্যতিরেকে সৎপথে আসিতে অক্ষম, প্রভু। তুমি সবই জান, দয়াময়, তোমার অনুগত দাসকে এই গোনাহ্‌গার হইতে অতি দূরে থাকিবার শক্তি দাও, বিভু। আর কিছু

চাই না। সকল প্রশংসা তোমার, ইস্‌লাম সত্য, তুমি সত্য, তোমার প্রেরিত নবি সত্য, আমিন্‌।"

মোনজাত পাঠান্তে সকলেই উঠিয়া যার যার স্থানে চলিয়া গেল। কিন্তু দুঃখের বিষয় খোদা যাহাকে শক্ত করিয়াছেন, মানুষ তাহাকে কি করিয়া নরম করিবে? তাহার কঠিন প্রাণ কিছুতেই বিগলিত হইবার নহে। বিশেষতঃ কাজী সাহেবের অজ্ঞাতসারে বিবীসাহেবা ইতিপূর্ব্বেই নিদ্রাদেবীর করুণ আহ্বানে চলিয়া গিয়াছিলেন। কাজেই মাওলানা সাহেবের এত পরিশ্রমের ফল—যুক্তি-তর্ক-পূর্ণ বক্তৃতা তাহার মনের উপর আশানুরূপ কার্য্য করিয়াছে কিনা সন্দেহ।

নবম পরিচ্ছেদ।

গুণ্ডাদের কাণ্ড।

বৃহস্পতিবার। শুভলগ্ন দেখিয়া কতগুলি গুণ্ডার চক্রান্তে জমাদার পুত্র লানতুল্লার সহিত ছালেমার বিবাহের তারিখ ঠিক করা হইয়াছে। জমাদার, উচ্চ-কুল-প্রসূতা পুত্রবধূর কথা মনে করিয়া নিজকে অনেকটা গর্ব্বিত মনে করিতেছিল। লোকেও বেশ তাহার মনের গতি বুঝিতে পারিয়া, মুখের উপরেই দু'চার ঘা প্রশংসা চাপিতেছে। তাহাতে তাহার স্বাভাবিক গর্ব্ব আরও স্ফীতাকার ধারণ করিয়াছে। কিন্তু এ যাবত নিজ ভবনে কল্পিত পুত্রবধূ দর্শন না হওয়ায় মনটা একটু খারাপ। বিশেষতঃ জমাদার স্ত্রী আসিয়া বলিল, "আমি ত একা তোমার এ হকল্ কাজ-কর্ম্ম কর্‌তে পারবো না। আমার হতভাগী রাঁড়ী মেয়েটার কোপালেও আর একটু সুখ অইল না।" এই বলিয়া সে জমাদারের দিক হইতে অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া বিদ্যুৎ-বেগে তথা হইতে চলিয়া গেল। যাইবার সময় কেবল তাহার বিধবা মেয়েটীকে খুব বিরক্তির সহিত একটা ধমক দিয়া চলিয়া গেল। পর-মুহূর্ত্তেই জমাদার তাহার কনিষ্টপুত্র লাতুমিঞাকে খবর সহ কাজীপত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিল। পথে আসিতেই কাজী সাহেবের সহিত লাতুর সাক্ষাতে তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া যে খবর সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে প্রথমতঃ শিহরিয়া উঠিলেন, পরে ক্ষণেক প্রস্তরবৎ দাঁড়াইয়া থাকিয়া উর্দ্ধে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ বলিলেন, "তা হ'লে গোপনে

গোপনে ষড়যন্ত্র ক'রেই অনাথা মেয়েটার বিয়া হবে! এই কি তোমারও ইচ্ছায়, দয়াময়?" অনন্তর কাহাকেও কিছু না বলিয়া তথা হইতেই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। বিবী সাহেব, কাজী সাহেবের অন্তর্ধান সম্বন্ধে কোন কল্পনা করিতে পারেন নাই। কেবল এই মনে করিয়া একটু সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে, স্বামী বাড়ী না থাকিলে উপস্থিত কার্য্যের যথেষ্ট সহায়তা হইবে। একবার 'কলেমা' হইতে পারিলে আর ছাড়ে কে, মারেই বা কে?

এদিকে জমাদার বাড়ীতে আজ ভয়ানক হলুস্থূল। প্রতিবেশী যুবকবৃন্দ অনেকই বদমায়েস্-কিছিমের। ছালেমার রূপলাবণ্যের কথা লানতুল্লার নিকট শুনিয়া অবধিই তাহারা কাণাকাণি করিয়া বেড়াইতেছে।

১ম বদ্মায়েস্।—খোদা-বেটার একি আশ্চর্য্য বিচার। লানতুল্লার মত একটা দুর্ব্বৃত্ত লোক—যে দিন-রাত্ সমানে অপকর্ম্ম ক'রে গাঁয়ে ঘুর্ছে, তার স্ত্রী-ধনটী যেন স্বর্গের অপ্সরা! সে জগতে অতুলনীয় রূপসী!!

২য় বদ্।—এ যেন লৌহ-কাঞ্চনের সংযোগ হবে, কালে কালে কত দেখ্ব, আর কতই বা শুন্ব!

৩য় বদ্।—দুনিয়াই পরিবর্ত্তনশীল ভায়া, শুন্ছি আখেরি জমানা অতি সন্নিকট, ভাল মন্দে আর তারতম্য থাক্বে না। তা না হ'লে কি এত পস্তাইতে হত!

৪র্থ বদ্।—হঁা তাইত, আর রইল কৈ? আচ্ছা দেখা যাক।

১ম বদ্।—সাধে কি আর বৈষ্ণবধর্ম্মে বলেছে, মাগুড় মাছের ঝোল, নব-নারীর কোল, আর বল হরি বোল্।

২য় বদ্। আ—হা-হা-হা-হাহ।

৩য় বদ্। ও—হো-হো-হো-হোহ্।

৪র্থ বদ্। ই—হি-হি-হি-হিহ্

ইহাদের ভিতর গোঁয়ার-গোবিন্দ-কিছিমের একটী বদ্মায়েস বলিয়া উঠিল "আর কয় দিন ভাই খোদার বিচার-শক্তি প্রখর থাক্‌বে? নতুবা দেখ্‌ত—" বলিয়া একটু বিট্‌কেলে জিহ্বা কাটিয়া থামিয়া গেল। এই প্রসঙ্গে সকল যুবকই নিজ নিজ প্রণয়িনীর চেহারা ও অঙ্গসৌষ্ঠব সালেমার সহিত তুলনা করিয়া লজ্জিত হইল। কেহ কেহ বা স্বীয় প্রণয়িনীর যথেষ্ট ও অতিরঞ্জিত বাহাদুরী করিলে, তাহাদের মধ্যে যাহারা ছালেমাকে স্বচক্ষে দেখিয়াছে তাহারা ঘোরতর প্রতিবাদ ও আপত্তি করিয়া বসিল। ইহাতে মতানৈক্য উপস্থিত হইলে, "কালই দেখা যাবে" বলিয়া সকলেই যে যার স্থানে চলিয়া গেল।

বাস্তবিক লানতুল্লাও এতদিনে অসততার চরম-সীমায় উপনীত হইয়াছে। এখন আর কাহারও মুখপানে চাহিয়া কথা কহিতে পারে না। চক্ষুকোণে কালিমা দেখা দিয়াছে, প্রকাশ্য স্থানে যাতায়াত করিতে দ্বিধা বোধ করে। এক কথায় বলিতে গেলে নৈতিক বলের লেশমাত্রও তাহার নাই। তাই সত্য কথা বলিতে গেলে, বদ্মায়েসদের ভিতরে ইতঃপূর্ব্বে লানতুল্লার সম্বন্ধে যে কদাকার মন্তব্য পাশ করা হইয়াছিল, তাহা অযৌক্তিক নহে।

সময় কাহারও অপেক্ষায় বসিয়া থাকে না। দেখিতে দেখিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গেল, সেই দ্বাদশ ঘটিকা রজনীর অমানিশা ভেদ করিয়া একজন লোক জমাদার বাড়ীর পশ্চাদ্দিক হইতে খুব-জোরে চীৎকার করিয়া ডাকিল। এ ডাক খুব বিকৃতস্বর-যুক্ত এবং আসন্ন-বিপদ-সঙ্কুল বলিয়া সর্ব্বাগ্রে নৈমদ্দি ও পরে বাড়ীর অন্যান্য লোকজন সে দিকে দৌড়িয়া অগ্রসর হইল। গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইয়া যাহা

দেখিল তাহাতে বিষয় খুলিয়া বলিবার কোন প্রয়োজন নাই। কেবল নইমদ্দি বলিয়া উঠিল, "মিয়া ভাইর্ বেহুস্ আবস্থা!" জমাদার স্ফীতোদর বহন করিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাই নইমদ্দির একথা শুনিবা মাত্র, "এঁ" বলিয়া যেই মাথা নোওয়াইয়া লানতুল্লার চোকের দিকে তাকাইতেছিল, অমনি কেন ধক্ করিয়া শ্বাস রোধ হইবার উপক্রম হওয়ায় মাথার টুপী খুলিয়া নাকটা চাপিয়া তথা হইতে সরিয়া পড়িল। অতঃপর রোগীকে ধরাধরি করিয়া মৃতবৎ গৃহে আনা হইল। তাহার কোন সাড়া-শব্দ নাই। সকলেই অন্তিম-কাল ভাবিয়া কান্নাকাটি করিতে লাগিল। বিশেষতঃ পিতামাতা ছেলে-মেয়ের বিপদ সময়ে প্রায়শঃ তাহাদের দোষ দেখেন না। এমন কি কখন কখন দোষাবলীকে এরূপ ভাবে বর্ণনা করেন যে তাহাতে মনে হয় যেন প্রকৃত পক্ষে তাহাদের কোন দোষ নাই, বরং সবই গুণ। তাই জমাদার স্ত্রী যতই আর্ত্তনাদ করিল, ততই তাহার শোক উথলিয়া উঠিতে লাগিল। সে পুত্রের অন্তিম মুহূর্ত্তের কথা চিন্তা করিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়, হায় আমার যাদুর আর বউ দেহাও অইল না। হায়, হায় ছালামীতে দুই শত টেকা দিছে, আর যাদু আমার সংসার ছাইরা চল্ছে রে। হায়, কে কোথায়, আমার বাছাকে বাঁচাইয়া দে।" এরূপ রোদন করিতে করিতে সে অস্থির হইয়া উঠিল। বারংবার করাঘাত করিয়া বক্ষ বিদীর্ণ করিতে লাগিল। এই সময় লানতুল্লা ভয়ানক বেগে বমন করিতে আরম্ভ করিল। তাহাতে কাঁচা মদের গন্ধে সেখানে তিষ্ঠিতে না পারিয়া অন্যান্য সকলেই স্থানান্তরে গমন করিলে তাহার জননী কুক্ষির অগ্রে বিষ্ঠা মাখিয়া পুত্রের মুখে দিতে লাগিল। কারণ সে শুনিয়াছিল যে বিষ্ঠা মদ-নিশা নিবারক। ঔষধের গুণে পুত্রের পঞ্চাত্মা ফিরিয়া আসিল। সে চক্ষু-

উন্মীলিত করিয়াছে দেখিয়া মাতা আশায় পুত্রের মুখচুম্বন করিতে অগ্রসর হইল। পুত্রও ঠিক সই মুহূর্ত্তে একটু সঞ্জীবিত হইয়া হাই তুলিল। মাতা তখন, জানি না কেন, একেবারে থতমত খাইয়া গোলাকার চুম্বন নাকে টানিয়া লম্বা করিয়া সাড়ীর আঁচল মুখে নাকে দিয়া দুই তিন পদ পাছে সরিয়া মাটিতে বসিয়া রহিল। আর পুত্রের অসচ্চরিত্র চিন্তা করিয়া মনে মনে কতই না দুঃখ করিল। এই অবস্থায় সেই নিশার তিমিরাবরণ কাটিয়া গেল। প্রাতঃসূর্য্যের লোহিত বরণে জগৎ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল লানতুল্লাও রাত্রির মদ-নিশা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছে, এখন বেশ সুস্থ। কারণ সেও ত প্রকৃতির জীব প্রকৃতির বিপক্ষে আর চলিতে পারে না!

পাঠক আসুন, জমাদারের কনিষ্ট-পুত্র লাতু কাজীপাড়া হইতে লানতুল্লার বিবাহ-সম্বন্ধে কি খবর লইয়া আসিল, তাহা শ্রবণ করিয়া লানতুল্লার ভাগ্যাকাশের নক্ষত্ররাজির শুভাশুভ লক্ষণ গণনা করি। বোধ হয় ভুলিয়া যান নাই যে, পূর্ব্বদিন সন্ধ্যার প্রাক্কালেই জমাদার তাহার স্ত্রীর বাক্যবাণ সহ্য করিতে না পারিয়া 'শনিবার রাত্রিতেই যথা-কৌশলে, অথবা আপনার পরামর্শানুসারে জোর-জবরে শুভকর্ম্ম সমাধা করিতে চাই, আশা করি প্রস্তুত থাকিবেন' কথা কয়টী একখানা কাগজে লিখিয়া লাতুকে কাজীপত্নীর নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিল। এবং মুখে মুখেও এই কথা কয়টী গুপ্ত ভাবে বলিয়া দিয়াছিল বালক কাজীপাড়া গ্রামে পঁহুছিয়া বিবীসাহেবার হাতে পত্রখানা প্রদান করিল। বিবী সাহেবা বালককে সেদিনকার জন্য সে বাড়ীতেই আতিথ্য গ্রহণ করিতে বলিল। বিশেষঃ কাজী সাহেব সেদিন বাড়ীতে ছিলেন না, কাজেই এই প্রস্তাবে বিবী সাহেবাকে বাধা দিবার কাহারও অস্তিত্ব অনুভূত হয় নাই। পরদিন প্রাতে লাতু নিজ বাড়ীতে চলিয়া

গেল, এবং তাহার পিতার নিকট বলিল, "তারা বাপ-মেয়ে পরামর্শ করে আপনাদেরে নাকাল করবার চেরেষ্টা কর্‌তেছে।" এই বলিয়া বিবী সাহেবার লিখিত এক খানা পত্রও জমাদারের হাতে দিয়া খেলা করিবার জন্য বাহিরে চলিয়া গেল। পত্রখানায় এরূপ লিখা ছিল—, "আমার আদাব জানিবেন। বাপ-ঝি পরামর্শ করিয়া আমার ও আপনার মুখে ছাই দিতে চাহিতেছে। আপনার পুত্রের শুভকর্ম্ম যত শীঘ্র হয় ততই ভাল। অদ্য দিবাকর অস্তাচলে চলিয়া গেলেই সাবেক কথানুযায়ী আসিয়া হাজির হইবেন। আর এক শুভ লক্ষণ এই যে আমাদের এ ব্যাপারে এক মাত্র কণ্টক—মেয়ের পিতা- গত রাত্রেই কোথায় চলিয়া গিয়াছে: কাজেই তাহার অনুপস্থিতিতেই কাজ সমাধা করিতে হইবে। আর আপনি যে যে কথা বলিবেন, তাহাতেও আমি রাজি আছি।" বালকের কথা শুনিয়া এবং পত্র পাঠ করিয়া জমাদার ক্রোধান্ধ হইয়া বলিয়া উঠিল, "কী! কার সঙ্গে এত জিদ্‌? শালীর ঝিকে ঘাড়ে ধরিয়া বাতাসের আগে এখানে নিয়া আস্‌ব।" জমাদারের এই বিকট চীৎকার শুনিয়া 'হাঁ হুজুরের দল' স্থানে স্থানে উৎকর্ণ হইয়া থাকিল। প্রভুর ক্রোধাগ্নি দেখিয়া সকলেই অনবরত মনে মনে 'জু হুকুমে'র, মন্ত্র জপ্‌ করিতেছিল। পাঠক, স্মরণ করিয়া দেখিবেন, গত কল্য কয়েকটী বদ্‌মায়েস ছালেগার সহিত নিজ প্রণয়িনী দের তুলনা কালে মতানৈক্য উপস্থিত হওয়ায় 'কালই দেখা যাবে' বলিয়া তাহাদের তর্কের মিমাংসা করিয়াছিল। তাই আজ লাতু কাজীপাড়া হইতে কি খবর লইয়া আসিল তাহা জানিবার জন্য জমাদারের অন্দরবাড়ীর দরজার পার্শ্বস্থিত ঝোপ-জঙ্গলের আড়ালে যার-যার সুবিধা মত বসিয়া রহিল। কিন্তু সে খবর শুনা দূরের কথা, জমাদারের ভীমনাদে এখন যে যেদিকে পারিল, পলায়নের চেষ্টা করিল।

জামাতা ফতেআলী. চাকর নইমদ্দি এবং আরও তিন চারিটী গুণ্ডাসহ জমাদার ও লালতুল্লা ছালেমাকে আজ রাত্রি ১২ টার সময় ত্রিভুবন হইতে ছিনাইয়া আনিবার জন্য খুব বীর্য্যবিক্রমের সহিত দলেবলে ধাবমান হইল। বালিকার মনে, খুব সম্ভব একথা জাগরিত হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ লাতুর সহিত পরামর্শে কয়েক মিনিট পরেই তাহার বিমাতা কপাল কুঞ্চিত করিয়া অঙ্গুলি-সঞ্চালনে বলিয়াছিল, "দাসীর-ঝি, আজ দিনের মধ্যেই তোকে বাড়ীর বাহির কর্‌ব, তবে বুঝ্‌বি তুই, আমি কেমন বাপের ঝি। তোর এমন চৌদ্দ বাপকে আমি হাতেও লইনা, শকুনি শিয়ালকে তোর শরীরের মাংস খিলাইব, তবে ছাড়ব।" এতচ্ছ্রবণে বালিকা ভয়ে অভিভূতা ও জড়সড় হইয়া অনবরত কেবল তাহার পিতার আগমন ইচ্ছা করিতে লাগিল। বাড়ীর বাহির দরজায় যাইয়াও কাজী সাহেবের কোন সন্ধান না পাইয়া নিজ প্রকোষ্ঠে গিয়া হতাশ হইয়া পড়িল। আর যেন বিন্দু পরিমাণও শান্তি নাই; শিরায় শিরায় বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে লাগিল, ওষ্ঠ শুষ্ক ও শ্বাস রোধ হইয়া আসিল. বুকের ভিতর দপ্‌দপ্‌ শব্দ হইতে লাগিল। বালিকা এক মুহূর্ত্তও এক স্থানে উপবিষ্ট থাকিতে পারিতেছে না। কেবল মাঝে মাঝে কি যেন এক ভাব মনে হইলে বিষাদ-কালিমাচ্ছন্ন মুখমণ্ডলের মাঝে ক্ষীণ শান্তিরেখার চিহ্ন ফুটিয়া উঠে। তৎসঙ্গে প্রশস্ত দর্পণে তাকাইয়া আবার হতাশের ছায়া সমগ্রবদনে প্রতিফলিত করিয়া ঐ শান্তির ক্ষীণরেখাটীকে মলিন করিয়া দেয়। যখন বালিকার কচি-কোমল-প্রাণকে এ মানসিক চিন্তার প্রখর উৎপীড়নে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিতেছিল, তখনও বিমাতা উঁকি মারিয়া তদ্দর্শনে একটু সুখ অনুভব করিতেছিল। মনে রাখিও দুষ্টবুদ্ধি রমণী, যে অশান্তি তুমি নিজে ডাকিয়া আনিতেছ, তার সমভাগী তুমিও।

এ দুঃখের সহিত আপাততঃ এত সুখের জীবনকে অবসান করিতে হইবে। বিমাতা হইলেই কি তাহার কর্ত্তব্য এই? সাবধান! এখনও সময় থাকিতে সাবধান হও!!

দশম পরিচ্ছেদ।

চৌমুহনীর ঘটনা।

আষাঢ় মাসের দুর্যোগ রাত্রি। তাতে আবার আকাশ-ভরা মেঘ দিক্‌মণ্ডলকে ঢাকিয়া আছে। অল্পক্ষণের মধ্যেই টপ্‌টপ্‌ করিয়া এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গেল, ইহাতে শক্ত রাস্তা পিছিল হইয়া উঠিল। পদব্রজে তাড়াতাড়ি হাটা অসম্ভব; কিন্তু চক্রসংযুক্ত গাড়ী সাধারণ বেগ অতিক্রম করতঃ অধিকতর দ্রুত চলিতে সক্ষম। অন্ধকার এত নিবিড় যে, ব্যক্তিমাত্রই পথ চলিতে অন্ধকারের গায়ে ধাক্কা লাগিয়া যেন মাঝে মাঝে থামিয়া যাইতেছে এবং চারিদিকে মাথা ঘুরাইয়া তাকাইয়া বল সঞ্চার করিয়া আবার স্বীয় পথে অগ্রসর হইতেছে। যথাসময়ে বলিতে ভুল করিয়াছি যে, চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লা হইয়া যে পি-ডবলিউ-ডি রাস্তা মেয়াকে চুম্বন করিয়াছে তাহারই এক পার্শ্বে অনতিদূরে কাজী সাহেবের বাড়ী অবস্থিত। ইহাই পুর্ব্ববঙ্গের সুদীর্ঘ ও সুপ্রশস্ত রাস্তা বলিয়া বিখ্যাত। এ রাস্তায় দিনরাত্‌ গরু-ঘোড়ার গাড়ী বা মটর বাইক চলিয়া থাকে। তাই ঝড় বৃষ্টিতে, আস্তে অথবা তাড়াতাড়ি, চালিত যে কোন গাড়ী, দিনে অথবা রাত্রিতে তথায় দৃষ্ট হইলে, "এ গাড়ী কোথা যাবে? কার? কোথা হতে আস্‌ছে?" ইত্যাদি ন্যায্য প্রশ্ন করাও স্থানীয় লোকের নিকট বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে। এই সুবর্ণ সুযোগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া পাষাণহৃদয় জমাদার ও তৎপুত্র লানতুল্লা ছালেমাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া নিতে আসিয়াছে। যেই জমাদার বালিকাকে ধরিয়া গাড়ীতে

উঠাইতে অগ্রসর হইয়াছে, অমনি বালিকা চতুর্দ্দিকে সরিষার ফুল দেখিতে লাগিল, বাতাস ঘনীভূত হইয়া দৃষ্টিপথ অবরোধ করিল। বালিকা আর কিছু দেখিতে পাইল না, কেবল স্তরে স্তরে কাল অন্ধকার আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করিয়া ফেলিল। এ হৃদয়-বিদারক বিপদে বালিকা হতাশ হইবার মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে তাহার পার্থিব অবলম্বন একমাত্র পিতার কথা স্মরণ করিল। অমনি যেই সে "আব্বা আব্বা" বলিয়া আর্ত্তনাদ করিয়া হস্ত-প্রসারণ করিয়াছে এবং অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে, তখন জমাদারের কঠিন-প্রাণ ক্ষণেকের তরে নরম হইল। সে আর স্থির থাকিতে না পারিয়া বালিকার পিতৃস্থানীয় হইয়া, "মা" বলিয়া বালিকার প্রসারিত হস্তযুগল ধারণ করিয়া আস্তে মাটীতে শায়িত করাইল। বালিকাও অনেকক্ষণ যাবত সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়িয়া রহিল। তাহার কোন সাড়া শব্দ নাই, নিশ্বাস-প্রশ্বাস একেবারেই চলিতেছে না বলিয়াই অনুমিত হইল। তবে কাজী-পত্নী নাকে তুলা ধরিয়া দেখিয়াছে এখনও শ্বাসপ্রশ্বাস ক্ষীণভাবে বহিতেছে; তাহাও অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষ হইবে আশঙ্কায় জমাদারের ভীরু সহচরেরা একে একে তথা হইতে প্রস্থান করিল। এখন মাত্র লানতুল্লা, তাহার পিতা ও কাজী-পত্নীর ভিতর ছালেমার সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। জমাদার আজ তাহাকে ফেলিয়া যাইবে স্থির করিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেল। কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত লানতুল্লা আজই তাহার পাশবিক উত্তেজনার নিবৃত্তি করিবে। লজ্জাহীন তাহার পিতারও অনুগমন করিল না। কিঞ্চিৎ গবেষণার পর কাজী-পত্নী হঠাৎ দাঁড়াইয়া উঠিয়া নাসারন্ধ্র স্ফীত করিয়া লানতুল্লাকে রাগভরে বলিয়া উঠিল, "আমি আর কিছু জানি না তুমিই সব জান বাপু. তবে আমি এখনও তোমাকে সাহায্য কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।

তোমার বউ—তোমার ইচ্ছা, সবই তোমার। তবে শুন, আমি বলি, তাড়াতাড়ি কালু গাড়োয়ানের গাড়ীখানা নিয়ে এস. এখনি গাড়ীতে পূরিয়া আমি সহ নীরবে তাকে তোমার বাড়ী পর্য্যন্ত পঁহুছিয়া দিয়া আসি, দাসীর-ঝি এখনও অজ্ঞান. একটু সতেজ হইলে আবার কি আপদ আসিয়া পড়ে কে জানে ? কি বল ?"

অল্পক্ষণের মধ্যেই কালু গাড়োয়ান গাড়ী হাঁকাইয়া দরজায় আসিয়া উপস্থিত। লানতুল্লা ও কাজী-পত্নী ছালেমাকে অজ্ঞানাবস্থায় বহন করিয়া গাড়ীতে পূরিয়া আবার সম্মুখে গাড়ী হাঁকাইয়া চলিল। গাড়োয়ানও মাথার উপর তাহার চর্ম্মনির্ম্মিত রজ্জু ঘুরাইয়া আমাদের পূর্ব্বকথিত পি-ডবলিউ-ডি রাস্তা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। মাঠের নির্ম্মল বায়ু সোঁ সোঁ করিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিতে লাগিল। তাহাতে বালিকার মুখ-মলিনতা কথঞ্চিৎ দূরীভূত হইল বটে. কিন্তু এখনও পূর্ণসংজ্ঞা-প্রাপ্তির কোন লক্ষণ দেখা যায় নাই। এতাবস্থায় বালিকা কাতরস্বরে বলিয়া উঠিল, "আব্বা আব্বা, আমি কোথায় ?" তদুত্তরে নিকটে উপবিষ্টা রাক্ষসী বিমাতা বিদ্রূপাত্মক ভাষায় বলিল, "তোর মামুর বাড়ীতে।" সরলমতি কুটিলতা-বিবর্জ্জিতা বালিকা, অজ্ঞান হইবার প্রারম্ভেও বিপদের ঘনান্ধকারে উপায়ান্তর না দেখিয়া জীবনের অবলম্বন একমাত্র পিতাকে আহ্বান করিয়া জমাদারের "মা" প্রত্যুত্তর শ্রবণ করিয়া বাস্তবিক তাহাকে পিতা বলিয়া বিশ্বাস করিয়াছিল। তাই অশ্বযানেও পিতা সঙ্গে আছে ভাবিয়া তাহার অবস্থিতি সম্বন্ধে একটা কথা জিজ্ঞাসা করিল। আবার এখনও বিমাতার প্রত্যুত্তরে, মামাবাড়ীতেই আছে অথবা মামা বাড়ীতেই যাইতেছে. এরূপ ভাব অন্তরের সহিত বিশ্বাস করিয়া লইয়াছে। দেখা যাক, কিসে কি হয়। বিশ্বাসই বা কতদূর শক্তিশালী। খোদার ফজলে বালিকা আস্তে আস্তে

আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্ববৎ চক্ষু মুদিয়াই মানসিক ও শারীরিক শক্তি সঞ্চার করিতে লাগিল।

ইত্যবসরে গাড়ীখানা প্রাগুক্ত পি-ডবলিউ-ডি রাস্তায় অবস্থিত হড্‌সন্ ব্রী.জর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। এই ব্রীজ পার হইলেই বড় রাস্তাকে ক্রস্ করিয়া একটী গলি রাস্তা দুই দিকে চলিয়াছে. এই গলিরাস্তাদ্বয়ের একটী নেহায়েত অল্প-পরিসর; গাড়ী চলিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহাতে অনুমান আধ মাইল চলিলেই সংক্ষেপে আমাদের পূর্ব্বপরিচিত জমাদার বাড়ী পাওয়া যায়।

পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মৃত হন নাই যে, এই স্থানেই জমাদার বাড়ী যাইবার জন্য গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া বিমাতা ছালেমাকে ধম্‌কাইয়া বলিয়াছিল, "দাসীর ঝি, তাগদা চল।" আর বালিকাও, "আব্বাত আমায় কিছু ব'লে যাননি" বলিয়া তাহার অনুগামিনী হইতে বাধ্য হইয়াছিল। কয়েক পদ অগ্রসর হইতে না হইতেই, এমন কি ঐ গলি রাস্তায় না উঠিতেই লানতুল্লা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিল। কাজীপত্নী নিশ্চিত করিয়া কিছু বুঝিতে না পারিলেও বিষয় বিপদজনক মনে করিয়া অন্ধকারে হাত্‌ড়াইয়া পলায়ন করিতে লাগিল। মুহূর্ত্তমধ্যে বালিকা দেখিল, চৌমুহনীর কোণে এই রজনীর গাঢ় অন্ধকারে সে একাকিনী দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথা ঘুরিতে লাগিল। সব যেন তাহার নিকট ছায়াবাজি বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল, কোথায় বা তাহার পিতা, কোথায় বা মামা-বাড়ী! সে এই আকস্মিক ঘটনার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না। অগত্যা এদিক সেদিক তাকাইয়া দেখিল কোথাও কিছু নয়নগোচর হইতেছে না। পদতলে দৃষ্টি করিয়া দেখিল, সব অন্ধকার, একপদ অগ্রসর হইবার স্থানও দেখা যাইতেছে না, তাই সে শেষ আশায় নির্ভর করিয়া ঊর্দ্ধে

নিরাশ্রয়ের আশ্রয়—খোদার প্রতি নেত্র উত্তোলন করিল। উপর দিকে চোক উঠাগতেই দেখিতে পাইল, তাহার 'আব্বা' আলোহস্তে চৌমুহনীর বিপরীতদিকস্থ গলি রাস্তাটীর দশ গজ দূর হইতে তাহার-দিকে অগ্রসর হইতেছেন। সঙ্গে কোনও লোকজন ছিল কিনা তাহা দৃষ্ট হইল না। কাজী সাহেবের হাতে আলো ছিল বলিয়া তাঁহার আপাদমস্তক দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল। তখন বালিকার নয়নে তৎপিতার শুভ্রগোঁপ-শ্মশ্রুরাজি এবং পক্ক কেশগুচ্ছ কিরূপ মনোহর অনুভূত হইতেছিল, তাহা ঐ বালিকা বই আর কে বুঝিবে? তদ্দৃষ্টে বালিকা, "আব্বা, আব্বা, আমাকে এখানে একা ফেলে আপনি কোথা গিয়েছেন্" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। কাজীসাহেব এ ঘোর-রজনীর ত্রিযামে একটী জনমানব শূন্য প্রান্তরে স্বীয় কন্যার কণ্ঠস্বর শ্রবণ করিয়া প্রথমতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়কে বিশ্বাস করিতে পারিলেন না। কিন্তু একটু অগ্রসর হইলে, ছালেমা পিতার কোমড় জড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল। তিনিও তাহার কোমল-করাঙ্কিত কোমর-বেষ্টন আরও দৃঢ়-ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া ব্যগ্রতা সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো মা, তুমি এখানে কেন? তুমি, তুমি কিনা সত্য বল।" বালিকা বলিল, "কেন আব্বা, কি বলছেন্! আপনি এই না বাড়ীতে বল্লেন, মামা-বাড়ী যাবেন!! আম্মা কই গেলেন?" কাজীসাহেব এ ঘটনার কিছুই উপলব্ধি করিতে পারিলেন না, তিনি মাথায় হাত মারিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন। প্রথমতঃ তিনি মনে করিলেন এ স্বপ্ন। কিন্তু খুব সাবধানতার সহিত বুঝিয়া দেখিলেন, না, তিনি নিদ্রিত নন। তবে কি ইহা জাগ্রত স্বপ্ন? অনন্তর মনে করিলেন যে, জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্ন হইতেই পারে না। তিনি হয়তঃ হঠাৎ কোন অ-চেনা ঐন্দ্রজালিকের দেশে আসিয়া পড়িয়াছেন! ইত্যাকার

আলু-থালু চিন্তা-স্রোত যখন দ্রুত হইতে দ্রুততর বেগে তাহার মনকে অস্থির করিয়া তুলিতেছিল, এমন সময় ছালেমার পশ্চাদ্দিক হইতে একটী যুবক খুব দৃঢ়তার সহিত হাঁপাইতে হাঁপাইতে কাজী সাহেবকে বলিল, "ফুফাজি, এত অস্থির হলে চলবে না। বিষয় বুঝবার বাকী নাই। সবই বুঝতে পারবেন। খোদা সহায় থাকলে কেউ কারো ইজ্জত মারতে পারে না। এখন তাহাকে লইয়া আমাদের বাড়ী চলুন"। আলোর দিকে অগ্রসর হইয়া তখন যুবক ছালেমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তোমার শরীরে কোনোও আঘাত-টাঘাত নাইত?" ছালেমা যুবকের বদনমণ্ডলের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া খুব লজ্জিতভাবে মাথা নোওয়াইয় কয়েক মিনিট পরে কেবল একটী কথায় উত্তর দিল, "না"। এখানে আর উপস্থিত ঘটনা সম্বন্ধে কোন আলোচনা না করিয়া তাহারা সকলেই যুবকের কথানুযায়ী ছালেমার মামার বাড়ীতে চলিয়া গেল।

———

একাদশ পরিচ্ছেদ।

ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র !

জমাদার কাজী সাহেবের ঋণ পরিশোধ করা দূরের কথা, বরং তাঁহার ভিটিভূমি দখল করিবার সঙ্কল্প আঁটিয়া বসিয়াছিল। তজ্জন্য সে কার্ত্তিক সাহার সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছে যে, সে-ই তাহার সম্পূর্ণ দাবীর টাকা পরিশোধ করিবে; আর কার্ত্তিক সাহাও কাজী সাহেবের নামে পনের শত টাকার দলিলখানা তাহার নিকট বিক্রয় করিবে। কার্ত্তিক সাহা প্রথমতঃ মুসলমান খাতকের সহিত এতদূর বিশ্বাসঘাতকতা করিবার সাহস পায় নাই। কিন্তু জমাদারের প্ররোচনায় অবশেষে কাজী সাহেবের নামে যাবতীয় খরচাদি সহ ২০০০৲ টাকার দাবী আদালতে উপস্থিত করতঃ ডিক্রী করাইয়া লইল। কিন্তু বাড়ীতে এত অধিক টাকার ক্রোক উপযোগী কোন অস্থাবর সম্পত্তি না পাওয়াতে কাজী সাহেবের নামে ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইল। অপমান করিবার জন্য লালতুল্লার চক্রান্তে ওয়ারিশ সূত্রে ছালেমার নামও এতদ্‌সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়। যিনি কোন দিন আইনের ঘরে সাক্ষ্য প্রদান করেন নাই, করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়াছেন, আজ খোদার ইচ্ছায় তাঁহার গ্রেপ্তার—কেবল তাহাই নহে, আরও অবলা অবিবাহিতা কন্যার গ্রেপ্তার! কি আশ্চর্য্য ব্যাপার!! তিনি নিতান্ত মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন, দুনিয়া তাঁহাকে যেন একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে; এ ঘোর-বিপদসঙ্কুল অশুভ লগ্নে তিনি যেখানে বসিয়া থাকেন, সেখানেই বসিয়া থাকেন। উঠিয়া অন্যত্র যাইবার কথা তাঁহার স্মরণ থাকে না।

পথ চলিতে আরম্ভ করিলে, কেবল চলিতেই থাকেন; কোথায় যাইবেন তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। কি যেন মোহিনী-শক্তির গুণে গ্রামের প্রতিবেশীরা পর্য্যন্ত তাঁহার প্রতিকূলে দাঁড়াইয়াছে। পরিবারের ভিতরেও লোকের নিতান্ত অভাব। তাঁহার দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত যে ছেলেমেয়ে ছিল, তাহারা পক্ষাবধি স্বীয় মাতার নিরুদ্দেশে কয়েক দিন কান্নাকাটি করিয়া তাহাদের নানার বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে। যখন তাঁহার সুদিন ছিল, গ্রাম্য বালক-বালিকারা কাজী-পত্নীর তিরস্কারাদি সত্ত্বেও এ বাড়ীতে যাওয়া-আসা করিত। কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন ঐ সকল গ্রাম্য-কাঙ্গাল মেয়েছেলের কথা দূরে থাকুক, খুব ঘনিষ্ঠ আত্মীয় স্বজনও পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছে। একটি প্রাণীও যেন এ বাড়ীতে আসিতে রাজী নহে। কোথাও টুঁ শব্দটী নাই। তিন মাস পূর্ব্বে যে সূর্য্য প্রসন্ন হইয়া তাঁহার বাড়ীর ঠিক উপর দিয়া গমন করিত আজ তাহাও যেন বাম হইয়াছে, এখন আর সে পথে আসা হয় না; পূর্ব্ব পথ ত্যাগ করিয়া অনেক দক্ষিণে সরিয়া আড়-চোখে চাহিয়া বিদ্রূপের হাসি হাসিয়া চলিয়া যাইতেছে। নিষ্ঠুর প্রকৃতির ভ্রূকুটিতে কাজী সাহেব ত্যাগের প্রতিমূর্ত্তি বরণ করিয়া লইলেন। তিনি কিছুই চাহিতেছেন না, কেবল বলিলেন, "হে খোদা এ কি তোমার আশ্চর্য্য খেলা! ধন-জন-যশ-মান সবি এক সঙ্গে লুপ্ত হইল! সকলি ছিল, অথচ কিছুই নাই, এ কোন্ পাপের পরিণাম, খোদা? অবাধ্য-অসৎ স্ত্রীর সঙ্গই কি এ সর্ব্বনাশের মূল? তাই বলি, এ নশ্বর জগতেই তোমার লীলা বুঝা ভার, পরকালের কথা বলিব কি করিয়া? পদমর্য্যাদা সব কেড়ে নিয়েছ ত জীবনের এ দুঃসহ ভার রেখেছ কেন? সঙ্গে সঙ্গে ইহারও অবসান করা উচিত নয় কি? না, তা হ'তে পারে না। তবে আর হৃদয়ের পরীক্ষা হবে কোথায়?

সহিষ্ণুতা! বল সঞ্চার কর, স্থির ও অটল থাক। তবে ত বুঝ্‌তে পারব্ দুদিন আগে যার দিকে ভুলেও দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হ'লে ভক্তি গদ্‌গদ্ স্বরে অশ্রুবারি বর্ষণ কর্‌ত, আজ কালের কুটিল চক্রান্তে কেন সে অবজ্ঞার সহিত মুখ ফিরাইয়া যায়?" এই সিদ্ধান্ত স্থির নিশ্চিত করিবার জন্য তিনি বাড়ীর বাহির হইয়া নির্জ্জনে এক পুকুরের ধারে গিয়া বসিলেন। তখন সন্ধ্যার প্রাক্কাল কত কি নীরবে তাঁহার মাথায় খেলিতে লাগিল। সংসারের কোনো কথাই যেন তাঁহার মনে নাই। কেবল নানাবিধ চিন্তা ও ভাবের উদয়াস্ত অনুভব করিয়া ক্ষণে শান্ত, ক্ষণে অস্থির, ক্ষণে আবার শিহরিয়াও উঠিতেছেন। এ সময় যদি তাঁহাকে কেহ দেখিতে পাইত, তাহা হইলে সে মনে করিত যে, তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে পিপীলিকা অথবা বিষাক্ত মশা দংশন করিতেছে, আর যেন হস্তপদাঙ্গ বদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে তাড়াইতে পারিতেছেন না। বাস্তবিক, প্রাণে যাহার শান্তি নাই, পুকুরের নিকটস্থ নির্জ্জনে কেন, গভীর পর্ব্বতগুহায় ও পৃথিবীর স্বাভাবিক শব্দে তাহার ব্যাঘাত করিবে। প্রকৃতির জীব প্রায় একাধারে যাহার প্রতিকূলে, তাহার নিকট প্রকৃতিদেবীও ভয়ঙ্কর দানবী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অগ্রসর হয়েন। তাঁহার মনে হইল বুঝি, জগতে যুগান্তর উপস্থিত। কিসের যেন একটা গোর-গোল তাঁহার কর্ণে পঁহুছিতেছে বলিয়া বোধ হইল। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক কলহ-পূর্ণ স্বরে চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "বেহায়া, ফাঁদ চিনছ, ঘুঘু চিনছ না, আমরা এমনও বাপের ঝি না।" এমন সময়ে আস্তে আস্তে এক বেগ বায়ু গাছের পাতা নাড়িয়া প্রবাহিত হইল। তাহাতে ঝগরাটে মাগীটি বাতাসের প্রতি রাগভরে বলিয়া উঠিল, "আর কোনেক থান দিয়া পথ দেখ্‌ছ না, নাইলে আমার কদমফুলের সুগ্‌গেরাণ মনগাজি-ধনগাজির বাড়ীতে যাবে কিবায়।"

তখন ভোর হওয়ার সম্ভাবনা দেখিয়া একটি কাক কা-কা চীৎকার করিতে করিতে ঘরের ছাউনিতে উপবিষ্ট হইল। স্ত্রীলোকটী তাহা সহ্য করিতে না পাইয়া বকাবকি করিতে করিতে ঝাটা ধরিয়া উপরের দিকে নিক্ষেপ করিল। ঝাঁটার শক্ত গোড়া স্ত্রীলোকটীর শায়িত স্বামীর নাসাগ্রে পড়িয়া সাংঘাতিক আঘাত করিল। তাহাতে নাসিকা কাটিয়া যাওয়ায় তাহার কথা স্পষ্ট উচ্চারিত হইল না। সে স্ত্রীকে ধমকাইয়া, "শাঁয়রনী, তোর চুঁল এহনি ছিঁড়া ফাঁলায়াম" বলিয়া বিছানায় উঠিয়া বসিয়া নাক চাপিয়া ধরিল। অনতিবিলম্বে যাহা ঘটিল তাহা এখনি বর্ণিত হইবে।

স্ত্রীলোকটির অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত কলহ করা অভ্যাস। সর্ব্বদাই কলহপ্রিয়। আজ রাত্রে তাহার ঝগড়া-ঝাটিতে পুরুষ লোকটার ঘুমের যথেষ্ট ব্যাঘাত হইতেছিল বলিয়া সে মনে মনে চটিয়াছিল যে, একবার সুযোগ পাইলেই তাহাকে যথোপযুক্ত শাস্তি দিয়া ভূত ছাড়াইবে। কিন্তু যখন সুযোগ-উপরিও কিছু হইয়া গেল, তখন আর নিশ্চিন্ত থাকা যায় কি করিয়া? ঐ পূর্ব্ব ঝাটাখানা এক হাতে করিয়া অন্য এক হাতে নিজের নাক চাপিয়া স্ত্রীকে ভীষণ প্রহার করিতে লাগিল। প্রহারের গুণে স্ত্রীলোকটির বক্তৃতা শক্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। সে যতই ঝাটার সদ্ব্যবহার করিল, ততই অধিকতর প্রয়োজন বলিয়া বোধ হইল। ফল কথা ঝাটা প্রহারে স্ত্রীর রসনা-সংযত ত হইলই না, বরং তাহার বাহু সঞ্চালনে পুরুষটীর নাসিকায় এবার রক্ত প্রবাহিত হইল। এরূপ হট্টগোল কিন্তু তাহাদের আজ নূতন নহে। প্রায়ই স্বামী-স্ত্রীতে দৈনিক দু'একবার এবম্বিধ বাক্‌বিতণ্ডা, প্রয়োজন হইলে মাঝে মাঝে উত্তম-মধ্যম, দক্ষিণারও আদান-প্রদান হইয়া থাকে। তাই, ইহাদের ভিতর কোনও গোলমাল শুনিলে, তাহা নিবারণ করিতে

চেষ্টা করা বা কান পাতিয়া শ্রবণ করা বিশেষ প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিবেশীদের কেহই মনে করে না। কিন্তু আজ বিষয় এতদূর দাঁড়াইয়াছে যে, নিকটস্থ বাড়ীর যুবা বৃদ্ধ সকলেই, কেহ বিবাদ মীমাংসা করিতে, কেহ বা তামাসা দেখিতে এখানে আসিয়াছে। প্রতিবেশীদের যথেষ্ট ছেলেমেয়েও এই মাত্র ঘুম হইতে উঠিয়া যার যার পিতামাতার সঙ্গে পথ ধরিয়াছে। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই 'মহারাজের' মার জীর্ণ-কুটীরের সম্মুখে আজ অনেক লোকের হুলস্থূল দেখিয়া আরও লোক কৌতূহল-পরবশ হইয়া তথায় জমাট হইতে লাগিল। ঘণ্টা কাল মধ্যেই তথায় আর লোক ধরে না; অনেক দূর লইয়া লোক চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে।

এ দিকে আমাদের কাজী সাহেব উদাসীনের মত এখনও প্রাগুক্ত পুকুরের ধারে বসিয়াই আছেন। রাত্রির ভয়ানক তিমির-রাশি তাহার চোকে হাত বুলাইয়া যাইতেছে, ঘুমও অনেক পূর্ব্ব হইতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়াছে। তথাপি রক্ত-মাংসের শরীর সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়জয়ে সক্ষম হয় না; মাঝে মাঝে যদিও দু'একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়াছিলেন, তথাপি তিনি কোথায় বা কেন, কিছুই বুঝিতে পারেন নাই। অর্দ্ধ-রাত্রি হইতেই নিদ্রালু হইয়া পড়িয়াছেন; কিন্তু উঠিয়া গৃহে যাইবার বা তথায় শয়ন করিবার প্রবৃত্তি জন্মায় নাই বিধায় বসিয়া বসিয়াই নিদ্রোপভোগ করিতেছেন। আর মাঝে মাঝে যেন কাহারও গল-ধাক্কাতে অগ্রপশ্চাৎ অথবা এ-দিক সে-দিক পড়িবার উপক্রম হইয়াও, কেন জানি না, অথবা খুব সম্ভব, সহিষ্ণুতা বলে আবার সোজা হইয়া নিদ্রা-দেবীর সহিত জিদ্ খেলিতেছিলেন। এবার আর তাহা হইল না, পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। ঐ দেখ পড়ে পড়ে প্রায়, গেল পড়ে, চক্ষু মুদিত হইয়া আসিল! মস্তকের

ওজন ঘাড় আর বহন করিতে পারে না! ঐ! শরীরটাও হেলিয়া গিয়াছে, আর তিষ্ঠিতে পারে না বুঝি! সাবধান ভাগ্যহীন, সামান্য নিদ্রার মোহে ইতঃপূর্ব্বের অন্তান্তরিক যন্ত্রণার কথা বিস্মৃত হইয়া গিয়াছে। হয়তঃ এখনি লজ্জাদেবীর নিষ্ঠুর শেলে বিদ্ধ হইতে হইবে। সে অবমাননা সহ্য হইবে কি? বিচিত্র কি? হইবে না কেন? বিপদে, যেমন সুখের কথা মনে থাকে না, তেমন দুঃখের চিন্তাও আসে না। বিপদরাক্ষস সুখ দুঃখকে এক সঙ্গেই গ্রাস করিয়া বসে।

হঠাৎ পার্শ্বস্থিত কদলীবৃক্ষে কিসের এক চপটাঘাত লাগিয়া ঠাশ করিয়া এক শব্দ হইয়া গেল। তাহাতে 'মহারাজের' মার জীর্ণ-কুটীরের সম্মুখে সমবেত লোকজন দৌড়িয়া গিয়া কাজী সাহেবকে অর্দ্ধ-শায়িতাবস্থায় দেখিয়া কতই না ঠাট্টা করিল! ছেলেপেলেগুলি আসিয়া টিট্‌কারী মারিতে লাগিল। কেহ বলে, "বোধ হয় আজ থেকে পাগল হ'য়ে গেল"। কেহ বলে, "না হে, সব ফাঁকি-জুকি, দুদিন পরেই দেখ্‌বে সব ঠিকঠাক; খাওয়াদাওয়ার অভাব কি না?" এক বৃদ্ধা রমণী দয়ার্দ্রচিত্ত হইয়া বলিল, আহা এক দিন কত লোক পায়ে প'ড়ে দোয়া চাইছে, আহা! খরিফ্‌-জাদা, ঠাত্তা কইরো না! হাতে ধইরা উথাও।" বৃদ্ধার এ কথা প্রতিপালন করিতে যাইয়া কয়েকটী দুষ্ট বালক অবজ্ঞার সহিত কাজী সাহেবের পিঠে লাঠি অথবা গাছের শুষ্ক ডালের আগায় খোঁচা দিতে লাগিল যেন হস্তে স্পর্শ করিতে ঘৃণা বোধ হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছে "উঠ বুড়ো, ঘুম হতে। রাত্তি ভোর হয়েছে।" এতক্ষণে কাজী সাহেবের চৈতন্য হইল। তিনি সোজা হইয়া বসিলেন, চারিদিকে অবলোকন করিয়া যাহা দেখিলেন তাহাতে তিনি জীবনে মৃতবৎ জ্ঞান করিলেন। এত রাত্রি পর্য্যন্ত নিশ্চল অবস্থায় উপবেশন করিয়া থাকায় পায়ের গাঁইট ধরিয়া

গিয়াছিল। প্রথমতঃ মনে কিছু না করিয়াই স্বভাবসিদ্ধ গুণে দাঁড়াইতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু কতক দূর উঠিতেই পদদ্বয়ে চলচ্ছক্তি অনুভূত হইল না, একেবারেই উপরমুখী হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেলেন। তাহাতে হা-হা, হি-হি করিয়া কত আবালবৃদ্ধবনিতা বিদ্রূপাত্মক হাসি হাসিল। কেহ বলিল, "মাথাবুড়া সা'ব্ আজ বৈষ্ণব হইয়াছেন"। কেহ বলে, "না, না, তিনি সঙ্ সেজেছেন"। কাজী সাহেব দুই মিনিট কাল উপরের দিকে দৃষ্টি করিয়া তাঁহার পূর্ব্ব প্রভাব স্মরণ করিয়া একটু হাসিলেন। তৎপর আস্তে উঠিয়া তথা হইতে স্বীয় গৃহে প্রস্থান করিলেন এবং নিদ্রার ভান করিয়া অবশিষ্ট রাত্রিটুকু যাপন করিলেন। প্রভাতের কোলাহল কর্ণে প্রবেশ করিল, তিনিও গাত্রোত্থান করিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাধা করিয়া তিনি এই মাত্র অবসরপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তখন বেলা প্রায় আট ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে। ধনী, কাঙ্গাল সকলেরই প্রায় যেমন জলপান হইয়া গিয়াছে; কেবল, যাঁহার হস্তস্পর্শ না হইলে পান-ভোজন কয় দিন পূর্ব্বে অরুচিকর ছিল, তিনিই আজ দুই তিন দিন যাবৎ বুভুক্ষাগ্নিতে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছেন, কে তার খবর নেয়? তাই তিনি চলচ্ছক্তি রহিত হইয়া বসিয়া ধুনপায়ীর মত ঝিমাইতেছেন। এমন সময় দুইটি কনেষ্টবল্ কাজী আবদুর রসিদ ও বিবী ছালেমার নামে ওয়ারেণ্টনামা লইয়া ঘরের দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাদের যম-কালের মত ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখিয়া কাজী সাহেব হঠাৎ শিহরিয়া উঠিলেন, তারপর বিনম্র অবগত হইয়া বলিলেন, "গ্রেপ্তার! আমার অসূর্য্যম্পশ্যা কন্যা চিরপর্দ্দানশিনী ছালেমারও গ্রেপ্তার!! গ্রেপ্তার করিয়া—? থানায় যেতে হবে? ভাল কথা, যাই, হতভাগিনী, আয় তোকেও বাঁধিয়া দিই। যা—, গ্রেপ্তার হইয়া পিতার ঋণের দায়ে থানায় যা, সহরে যা।" বলিয়া

তিনি একটি কনেষ্টবল্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন. "আসুন, আসুন দারোগা বাবু, এখনি জীবনের শেষ রজ্জু ছিন্ন করিয়া নির্ভয়ে আপনাদের হাতে সমর্পণ করি। আর দুনিয়ার সুখ চাই না।" দুই পদ অগ্রসর হইয়া হঠাৎ থামিয়া গেলেন, "অহো! বাঁচিলাম, সে কোথায়? সে কি জীবিত, না মৃত? কিছুই স্মরণে আস্‌ছে না যে! অহো মনে হয়েছে, মনে হয়েছে, রাস্তার উপরে চৌমুহনিতে—না, তার পর? নানা বাড়ী। তার পর—" আর জানি না। তা হ'লে সেখানেই কি? এখনও? এ দিন কার তত্ত্বাবধানে? অহো মনে হয়েছে, সে দিন হতভাগ্য স্ত্রীটীর 'জানাজা' দিতে গিয়া দেখিয়াছি আমার গলার ধরে কেঁদেছে, হাঁ, এতক্ষণে বুঝিলাম, ছালেমা বড়সুন্দর গ্রামে তার নানা বাড়ীতেই আছে।"

কনেষ্টবল্‌দ্বয় বাহিরবাড়ী হইতে লালতুল্লার ইঙ্গিতে চলিয়া যাইতে উদ্যত হইয়াছে দেখিয়া কাজী সাহেব বলিলেন "বাবু, আমাকে গ্রেপ্তার করুন, এই আমি হাজির।" তখন কনেষ্টবল ধমক দিয়া চক্ষুর লজ্জাহীন চামড়া যথাসাধ্য উপরে টানিয়া ক্রোধান্বিত ভাষায় বলিল, 'আগে তোমকো নেহি, আগে উস্ লাগি কো পাকড়ে গা, পিছে তোমহারে মজা দেখ্‌লাইব।" লালতুল্লা পূর্ব্বেই পুলিশের সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়াছিল যে, তাহারা ছালেমাকে গ্রেপ্তার করিয়া থানাতে সর্ব্বসমক্ষে হাজির করিতে পারিলে তাহার হৃদয়ের জ্বালা নির্ব্বাপিত হয়। তজ্জন্য তাহাদিগকে যথোপযুক্ত পুরস্কারও দেওয়া হইয়াছিল। তাই কনেষ্টবল্‌দ্বয় কাজী সাহেবকে লইয়া গোলমাল করার চেয়ে আগে ছালেমাকে যাইয়া গ্রেপ্তার করাই সঙ্গত মনে করিয়া চলিয়া গেল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

পাপের পরিণাম।

পাঠক স্মরণ করিয়া দেখুন, লানতুল্লার ছোট ভাই লাতুর সহিত কাজী সাহেবের সাক্ষাৎ হওয়ায় এবং তাহার কথাবার্ত্তায় নানা সন্দেহ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাজী পত্নীর দুরভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া একটী কথাও না বলিয়া তখনই তাঁহার পূর্ব্বশ্বশুরবাড়ী বড়সুন্দর গ্রামে একাকী চলিয়া যান। স্ত্রীর চক্রান্তে এবং স্বীয় কন্যার আসন্ন বিপদে তিনি অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। স্ত্রীর প্রতি তাঁহার বিশ্বাস-স্নেহ কিছুই রহিল না। এই সর্ব্বপ্রথম কাজী সাহেবের অন্তরে অটুট দাম্পত্য প্রেমের ছিন্ন-পাশ দেখা দিল। বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন যে, আমরাও অনেকদিন পূর্ব্ব হইতেই কাজী-পত্নীর পৈশাচিক ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে পূর্ব্ববৎ বিবী সাহেবা না ডাকিয়া কেবল কাজী-পত্নী আখ্যা প্রদান করিয়াই আসিতেছি। যাহা হউক, এই আসন্ন বিপদের কোন প্রতিকার করা যায় কিনা তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিবার জন্য ছালেমার মামা-বাড়ীতে এক সভা বসিল। জমাদার বাড়ীর লোক খুব পরাক্রান্ত ও দুরাচার একথাও সকলের অজ্ঞাত ছিল না। মোটের উপর ছালেমার মামা-বাড়ীর যে কয়জন লোক তথায় উপস্থিত ছিল, তাহাদের অনেকেরই উদ্যম-চেষ্টার যথেষ্ট অভাব লক্ষিত হইল। কেহই সাহস করিয়া কোন কথা বলিতে পারিল না। কি যেন তাহাদের এক সিক্তভাব দেখিলে বিরক্তির উদ্রেক হয়। এই উদাসীনতার প্রধানতম কারণ,

এ বাড়ীর লোক জন কাজী সাহেবের দ্বিতীয় স্ত্রীর হাতে বিশেষ আদর-কদর পায় নাই। কাজী সাহেবও নাকি তৎপ্রতি বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। আর তাঁহার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর হইতে এ কয়েক বৎসর যাবত তিনি এখানে বিশেষ আসা-যাওয়া করিতেন না। তাই অনেকেই অসন্তুষ্ট। অদ্য সুযোগ বুঝিয়া সবদোষ কাজী সাহেবের ঘাড়ে চাপাইয়া বসিলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা চলিয়া যাইতে লাগিল, রাত্রি অবসানে আবার দিবাকর পশ্চিমাকাশে ঢলিয়া পড়িল। কিন্তু উপস্থিত বিপদের কোনও প্রতিকার হইতেছে না দেখিয়া কাজী সাহেব উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার উন্মাদনায় আর কাহারও উন্মাদনা মিলিত হইতেছে না দেখিয়া তিনি অবশেষে হতাশ হইয়া পড়িলেন; আর, এক স্থানে উপবেশন করিয়া তাঁহার বক্ষাভ্যন্তরের দুরু দুরু শব্দ কাণ পাতিয়া শুনিতে লাগিলেন। এই শিথিলতা ভঙ্গ করিয়া একটী যুবক, বেশ মানানসহি চেহারা, খুব বিনীত অথচ দৃঢ়তার সহিত উন্নত মস্তকে কাজী সাহেবকে প্রবোধ দিয়া বলিল, 'ফুফাজি, আমি এইমাত্র বাড়ী এসে যা জান্‌তে পার্‌লাম্‌ তাহাতে আমার রক্ত গরম হয়ে উঠ্‌ছে। আর বসে থাকা অসম্ভব; আমি অবলার উদ্ধারে চল্লাম। আমার ভয় হচ্চে ওকে ইতিমধ্যে তারা জোর করে বাড়ীতে নিয়ে যায়! আপনি আলো হস্তে আর দু'এক জন লোক সহ আসুন, আমি তাড়াতাড়ি গিয়া দেখি ঘটনা কতটুকু দাঁড়িয়েছে।" যুবক ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া চলিল। তখন রাত্রি প্রায় দ্বাদশ ঘটিকায় উপনীতা। যুবক ছালেমার পিতৃভবনে না গিয়া, মাত্র একটা রিভল্‌বার হাতে, সাহসকে একমাত্র সঙ্গী করিয়া জমাদারের বাড়ীর দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তথায় অনুসন্ধান করিয়া কোন চিহ্ন না পাওয়াতে তথা হইতে যে অল্প-পরিসর গলি-রাস্তা পি-ডব্‌লিউ-ডি রাস্তায় সংযুক্ত হইয়াছে,

তাহা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। যে স্থানে ইহা বড় রাস্তার সহিত মিলিত হইয়াছে, সে স্থানে আসিলেই লানতুল্লা তাহাকে দেখিয়া কিরূপ প্রাণের ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। তাহার এই হঠাৎ-পলায়নের যথেষ্ট কারণ ছিল। এক সঙ্গীন্ দাঙ্গাহাঙ্গামার মোকর্দ্দমায় তাহার ওয়ারেণ্ট জারী হয়; এতদিন যাবত একবার জামিনে মুক্তি পাওয়া সত্ত্বেও, পুলিশ অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারে নাই। থানার বড় দারোগা বাবু সেদিন তাহার বাড়ীতে যাইয়া তাহাকে না পাইয়া বলিয়াছেন, "কার সঙ্গে এত জোচ্চুরি? একবার ধর্‌তে পার্‌লে সব সোজা হয়ে যাবে।" ছাগলের ঘর হইতে দারোগা বাবুর এ গরম কথা শুনিয়া অবধিই রাত্রিতে কোন লোক দেখিলে লানতুল্লার অন্তরাত্মা থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠে। তাই আজ প্রাগুক্ত যুবক এত রাত্রে তাহার বাড়ীর দিক হইতে আসিতেছে দেখিয়া তাহাকে কোন পুলিশ মনে করিয়া সে প্রাণপণে দৌড়িয়া পলায়ন করিয়াছিল। ছালেমা বা কাজী পত্নী কাহারও কথা স্মরণ করিবারও তাহার অবসর হয় নাই। কাজী পত্নীও ছালেমাকে একাকিনী ফেলিয়া আতঙ্কের সহিত লানতুল্লার অনুসরণ করিয়াছিল। ঠিক সেই সময় যুবকের কথানুযায়ী কাজী সাহেব আলো হস্তে গৃহে ফিরিবার সময় চৌমুহনীর কোণে উপস্থিত হইয়া—কি প্রকারে ছালেমাকে দেখিতে পাইলেন তাহাও পূর্ব্বেই বিবৃত হইয়াছে।

পাঠক, এখন চলুন আমরা কাজী পত্নীর অন্বেষণে বাহির হই। দুর্য্যোগ রজনীর গাঢ় অন্ধকারে, পদব্রজে পথ চলিতে অনভ্যস্থা উচ্চকুলাহঙ্কারী রমণীর কি দুর্দ্দশা! যিনি একদিন অভিমানে কাহারও মুখ চাহিয়া কথা কহিতেন না, যে-সে লোকের বাড়ীতে যাইতে ঘৃণা

বোধ করিতেন, এবং কাহারও সহিত আলাপ কালে নিজ কুল-গৌরবের একটা টিপ্পনি না কাটিলে আলাপের পূর্ণত্ব রক্ষা হইত না, আজ একাকিনী, এ তিমিরাবরণে নিরাশ্রয়াবস্থায় তাহার কি দুর্দ্দিন জানিবার জন্য, বোধ হয় সকলেরই কৌতুহল জন্মিয়া থাকিবে। কাজী-পত্নী যতক্ষণ চৌমুহনীতে জনকোলাহল শুনিতেছিল, ততক্ষণ নিকটবর্ত্তী এক ঝোপের আড়ালে চোক বন্ধ করিয়া বসিয়াছিল। এখনও তাহার চোকে ঘুম, হৃদয়ে ভয় স্থান পায় নাই। রাস্তা হইতে যখন পথিকের যাতায়াত কোলাহল থামিয়া গেল, তখন তাহার চৈতন্য হইল। এ নিশিথকালে একাকিনী কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়া রাত্রি কাটাইবে তাহা স্থির করিতে পারিল না। অবশেষে নিজের বিপদে ছালেমার প্রতি দয়ার সঞ্চার হইল। কাজেই বালিকাকে সঙ্গিনী করিয়া কোথাও আশ্রয় গ্রহণ করিবে, অথবা সম্ভব হইলে বাড়ীর পথ খুঁজিয়া লইবে, এই স্থির করিয়া যেখানে বালিকাকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিল, তথায় অগ্রসর হইয়া তাহাকে না দেখিয়া প্রাণ বিদীর্ণ হইয়া গেল। উপস্থিত বিপদে সে হায় হায় করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঐ চীৎকার ধ্বনিতে প্রতিবেশী নিশাচর প্রাণীগুলি ভূতের কান্না মনে করিয়া দূরে দূরে সরিয়া গেল। এই সময় দুইজন লোক কোন মৃত্যু সংবাদ লইয়া তাহাদের আত্মীয় বাড়ী যাইতেছিল, হঠাৎ পথের পার্শ্বে এ অন্ধকার রাত্রির মধ্যভাগে স্ত্রীকণ্ঠে কান্না শুনিয়া তাহাদের ভগ্ন প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। একজন চুপি চুপি আর একজনকে বলিল, "এত রাত্রে মাত্র তুমি-আমি দু'টী লোক এ প্রকাশ্য পথে আসা ঠিক হয় নাই।" দ্বিতীয় লোক তাহাতে সাঁয় দিয়া বলিল "প্রকাশ্য রাস্তাই বল, আর অপ্রকাশ্যই বল, মরার খবর ভুত প্রেত সকলেই জানে।" পথিকদ্বয়ের কথাবার্ত্তার স্বরে রমণীটীর প্রাণে একটু জল আসিল, তাই আস্তে আস্তে

তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া ঘোঙ্‌গাইয়া কাঁদিয়া ফেলিল, তাহাতে তাহারা ভয়ে অস্থির হইয়া একে অন্যকে জড়াইয়া ধরিয়া দুই এক পা পশ্চাদ্দিকে সরিয়াই ভোঁ দৌড়। যে পর্য্যন্ত না তাহারা তাহাদের পরিচিত গৃহে পঁহুছিল, সে পর্য্যন্ত দৌড় হইতে বিরত হয় নাই! তথায় যাইয়া উভয়েই বুকে থুথু দিয়া ও মুখে আদা লবণ পূরিয়া আগুন স্পর্শ করিয়া লোকজন পরিবৃত অবস্থায় শয়ন করিয়া রহিল। সে দিন আর মৃত্যু সংবাদ দেওয়া ত দূরের কথা, তাহাদের ক্ষুন্নিবৃত্তিও হইল না।

এ দিকে রমণী অনন্যোপায় হইয়া অদৃষ্টকে শত ধিক্কার দিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে যে সরু রাস্তা ছালেমার মামা বাড়ীর দিকে চলিয়াছে তাহা অনুসরণ করিয়া চলিতে লাগিল। এ রাস্তা কোথা হইতে আসিয়াছে, কোথায় যাইবে তাহা সে কিছুই জানে না; তবে এদিকটাই বৃক্ষ-লতা-শূন্য ও ফরসা বলিয়া মনে হওয়ায় সে ইহা অবলম্বন করিয়া চলিতে লাগিল। যখন সে ছালেমার মামাবাড়ীর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়াছে। রমণীও সমস্ত রাত্রির অনিদ্রায়, ভয়ে ও লজ্জায় একেবারে জর্জ্জরিত হইয়া পড়িয়াছিল। পিচ্ছিল রাস্তা; হাঁটিতে হাঁটিতে পায়ের গোড়ালী ও নখ কাটিয়া গিয়া রক্তে লাল হইয়া গিয়াছে। আর, অন্ধকারে পথ চলিতে ঝোপ-জঙ্গল ও গাছ-লতার আঘাত লাগিয়া, উন্নত-নাসিকার অগ্রভাগ অবনত হইয়াছে। এ যাবত ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরের রক্তস্রাব বন্ধ ছিল, কিন্তু এখন যেই প্রাতঃসূর্য্যের উত্তাপ ক্ষত স্থানে লাগিল, দরদর ধারে আবার রক্তস্রাব হইতে লাগিল। ক্রমে পথ চলিতে অক্ষম হইয়া ঐ স্থানেই পড়িয়া রহিল।

গত রাত্রে ছালেমা রীতিমত ঘুমাইতে পারে নাই। কেন, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। সন্ধ্যা হইতে রজনী দ্বাদশ ঘটিকা

পর্য্যন্ত কালের ঘটনাবলী তাহার কোমল প্রাণকে পিষিয়া ফেলিয়াছিল। এখন ঐ সব ঘটনা তাহার নিকট জাগ্রত স্বপ্ন বলিয়া মনে হইতেছে। তাই আজ একটু বিলম্বেই উঠিয়াছে। এখনও রাত্রির ঘটনা সম্যক ভাবে তাহার স্মৃতিপথে জাগরূক হয় নাই। হঠাৎ সে শুনিতে পাইল যে, একটি রমণী বাড়ীর বাহির দরজায় জীবন্মৃতাবস্থায় পড়িয়া আছে। সকলেই কাণাকাণি করিতেছে—রমণীটীর যদিও কর্দ্দমাক্ত শরীর, তথাপি তাহার পরিহিত বস্ত্র ও শরীরের কান্তি দর্শনে ভদ্রমহিলা বলিয়াই প্রতীয়মান হয়। বালিকা এতচ্ছ্রবণে একটু অগ্রসর হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে আর তাহার বাক্যস্ফুর্ত্তি হইল না। কেবল উপস্থিত সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "আপনারা অতি শীঘ্র সযত্নে ইহাকে বহন করে বাড়ী নিয়ে আসুন।" অতিসাবধানেই রমণীটীকে বহন করিয়া অন্দরে নেওয়া হইল। কিন্তু ব্যারাম দিন দিন বাড়িয়া চলিল, শরীরের কোমল মাংস পঁচিয়া পঁচিয়া পড়িতে লাগিল। তাহার করুণ আর্ত্তনাদে পাষাণ-হৃদয় গলিত হয়; কিন্তু একবার নিকটবর্ত্তী হইলে শরীরের দুর্গন্ধে তথা হইতে সকলেই সরিয়া পড়ে। পায়ের পাতা ও নাসিকা হইতে সামান্য আঘাতে দর-দর করিয়া রক্তস্রাব হইতে থাকে। এক পক্ষ যাইতে না যাইতেই তাহার সেই সোণার শরীর কঙ্কালে পরিণত হইল। অন্য কেহ ত এখনও তাহাকে চিনিতে পারেই নাই, এমন কি ছালেমাও যদি পূর্ব্ব হইতে তাহার নিকট না থাকিত তবে তাহার বিমাতা বলিয়া চিনা তাহার পক্ষেও দুষ্কর হইয়া পড়িত। কাজী সাহেব চিনিয়াও তাহাকে চিনেন নাই। তাহার নাক মুখ ফুলিয়া চোক বন্ধ হইয়া গিয়াছে; এ দিক সে দিক নড়াচড়া করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম; কোনও প্রয়োজন বা যন্ত্রণার কথা প্রকাশ করিতে হইলে, হস্তপদাদি সঞ্চালন করিয়াই তাহা সম্পাদন করিতে হয়। মুখে প্রকাশ

করিতে অনেক সময় বিরক্তি বোধ করে। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহার অন্তিমকাল অতি সন্নিকট। তথাপি তাহার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। সকলেই ভিতরে ভিতরে খোঁজ করিয়া দেখিয়াছে, কোথাও এমন কোনও খবর পাওয়া যায় না যে, একটি রমণী নিরুদ্দেশ হইয়াছে। বিশেষতঃ ভদ্র বংশীয় রমণীদের অন্তর্ধানের খবর প্রায়ই প্রচারিত হয় না। যে একবার বাড়ীর বাহির হইয়াছে, তাহাকে ভিতরে আনিবার চেষ্টা খুব কমই করা হইয়া থাকে। তাই এ রমণী সম্বন্ধেও কোন তত্ত্ব-তালাশ নেওয়া হয় নাই। অবশ্য কাজী সাহেব যদিও প্রথম দৃষ্টিতেই চিনিতে পারিয়াছিলেন, তথাপি ছালেমার অনুরোধে তাহা আর কাহার গোচর করেন নাই। ছালেমা বুঝিতে পারিয়াছিল, জানিতে পারিলে, তাহার মামাবাড়ীর লোকেরা তাহার বিমাতাকে অমানুষিক অত্যাচার করিয়া জীবন্ত কবরে প্রোথিত করিবে। তাই ভয়ে ভয়ে সেও এ যাবত তাহা ব্যক্ত করে নাই। কারণ, যে রাত্রিতে ছালেমাকে পথে কুড়াইয়া পাইয়া এখানে নিয়া আসা হয়, সে রাত্রেই সে অনেককে বলিতে শুনিয়াছিল, "যদি ডাকিনী বিমাতাকে একবার মাত্র পাওয়া যায় তবে এতদিনের সুখ ও বাহাদুরী পিষিয়া বাহির করা হইবে।" কিন্তু এখন বিমাতার শেষমুহূর্ত্ত আসিয়া উপনীত হইয়াছে দেখিয়া আর সত্য গোপন রাখা সঙ্গত নহে মনে করিয়া বালিকা কাঁদিয়া ফেলিল, "মাগো আমাকে কার কাছে রেখে যাও?" রমণীও তখন আত্মপরিচয় দিয়া অতি কষ্টে কাতরস্বরে বলিল, "মা, অনেক কষ্ট দিয়াছি, মাপ করিস্। আর—তো—মা—র—আব্—বা—। আর বলিতে পারিল না কেবল হাব-ভাবে বুঝা গেল অন্তিমকালে একবার স্বামীকে দেখিতে চায়। চক্ষুদ্বয় নিমীলিত হইয়া আসিল এবং সে চিরকালের জন্য কোন অচেনা দেশের

উদ্দেশ্যে মহা প্রস্থান করিল। বালিকা (যে প্রকারেই হউক) মাতাকে হারাইয়া যারপর নাই দুঃখ করিতে লাগিল। মৃতব্যক্তি ফিরিয়া আসে না ; তাই এখন একমাত্র পিতাকে অবলম্বন করিয়া জীবনে শান্তি উপভোগ করিবে স্থির করিয়া লইল। কারণ মানুষত আর বরাবরই কেবল দুঃখ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে না ! কিন্তু বালিকার একমাত্র অবলম্বন পিতাও দৈন্য-দায়ে অস্থির ; তদুপরি বর্ত্তমান আকস্মিক বিপদে তিনি একবারে স্তব্ধ হইয়া, লোকের অভাবে পৈতৃক বাড়ীখানা নষ্ট হইতেছে মনে করিয়া, তিনি ছালেমাকে তাহার মামাবাড়ী রাখিয়া স্বয়ং এখানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এখানে থাকা অবস্থায় কালের নির্ম্মম ব্যবহারে তাঁহাকে কিরূপ লজ্জিত ও অপদস্ত হইতে হইয়াছে তাহা পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

অপরিণীতার ইজ্জতে আঘাত।

হরিপুর গ্রামটী পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পাহাড়ে লোক এখনও সম্পূর্ণ সভ্য হয় নাই। তাহাদের জীবনের সুখসম্ভোগ অধিক পরিমাণে শারীরিক বল-বিক্রমের উপরই নির্ভর করে। তাহারাও অনবরত তাহাতেই লিপ্ত। গ্রামের ঠিক পূর্ব্ব প্রান্তে স্বাধীন ত্রিপুরার সীমা-স্তম্ভ গায়ে অগ্নি মাখিয়া দাঁড়াইয়া আছে। স্বাধীন দেশের আইনানুসারে তদভ্যন্তর হইতে কোন দ্রব্য, এমন কি এক খণ্ড কাঠও বিনা হুকুমে ব্রীটিশে আনিবার অধিকার নাই। প্রকাশে ফৌজদারীতে সোপর্দ্দ করা হয়। কিন্তু সাধারণতঃ আইনের ভয়ে, কম লোকই তাহা মানিয়া থাকে। পাহাড়ের বন্যাঞ্চল বলিয়া সরকারের অস্তিত্বের বিশ্বাসটা তাহাদের একটু কমই আছে। ঐ গ্রামের হায়দর পহলওয়ান্ সকলের নেতা। তাহার নেতৃত্বে হইতে পারে না এমন অসৎ কর্ম্ম খুব অল্পই আছে। সে একে একে তিনটী স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিল; কিন্তু তাহাদের কাহারও সহিত রীতিমত বিবাহানুষ্ঠান হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কোন এক দিন স্ত্রীদের পিতামাতা, বা ভাই ভগ্নী এ বাড়ীতে অতিথি আসিয়াছিল কিনা তাহাও সন্দেহজনক। আসিবে কি করিয়া? যে দিন তাহাদের ভগ্নী-কন্যাকে জোর করিয়া দখল করিয়াছে, সে দিন হইতে তাহারা লজ্জা, অপমান ও ঘৃণায় মরণে মরিয়া আছে। এ পাশবিক বল প্রয়োগে তাহার সাহস বাড়িয়াছে। সম্প্রতি সে স্থানীয় দুলাল গাজীর অবিবাহিতা ষোড়শী কন্যার উপর কুদৃষ্টি নিক্ষেপ

করিয়াছে। দুলাল গাজি একজন মধ্যবিত্ত লোক ও সদ্‌গৃহস্থ। তাহার বাড়ীতে লোকজন কম, এই যা একটু অভাব। নতুবা অর্থ-সামর্থ্যে, মান-সম্ভ্রমে, একজন পরিচিত লোকই। এক নামেই চতুষ্পার্শ্বস্থ লোকে তাহাকে চিনিতে পারে। তাহারই যুবতী কন্যাকে পিতার সম্মুখ হইতে পশু বল প্রয়োগে হরণ করিয়া আনিবে স্থির করিয়া হায়দর পহ্‌লওয়ান্‌ তাহার অনুচর-সহচরদিগকে সংবাদ পাঠাইল। পাঠক! হায়দর পহ্‌লওয়ানের দলের ভিতর লানতুল্লাও যে একজন বিশিষ্ট গুণ্ডা, তাহা বোধ হয় কল্পনা করিয়াই নেওয়া যায়।

এখনও রাত্রি একাদশ ঘটিকায় পঁহুছে নাই। একে একে গুণ্ডারা নির্দেশানুযায়ী নেতার বাড়ীর পশ্চাদ্দিকস্থ বেতস্‌ বনে ওঁৎ পাতিয়া রহিল। অল্পক্ষণের মধ্যেই নেতা মোটা লাঠি হাতে করিয়া বাড়ীর বাহির হইল। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা জঙ্গলে আঘাত করিবা মাত্র এখান-সেখান হইতে শৃগালের ন্যায় দশ বারটী গুণ্ডা বাহির হইয়া তাহাদের নেতার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। দুই তিন মিনিট কাল আকার ইঙ্গিতে কি কি পরামর্শ করিয়া সকলেই রাত্রি সার্দ্ধ-দ্বাদশ ঘটিকায় দুলাল গাজির বাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত হইল। কোন কার্য্যোপলক্ষে যুবতী তখনও রন্ধন কার্য্যে নিয়োজিতা ছিল। রন্ধনশালায় আর কেহ-ই ছিল না। তাহার মাতা পিতা সদর গৃহে বসিয়া অন্য কার্য্যে সময় অতিবাহিত করিতেছিল। দুর্ব্বৃত্তেরা যুবতীকে একাকিনী দেখিয়া এবং অন্য লোকজনের সাড়া-শব্দ না পাইয়া, রন্ধনশালার আলোতেই তাহাদের পাশবিক উত্তেজনার উপশম করিবে স্থির করিল। হঠাৎ বাহির হইতে একটি দুর্ব্বৃত্ত ঘরে প্রবেশ করিয়া যুবতীর হাত ধরিয়া ফেলিল, আর একটি দুর্ব্বৃত্ত তাহার আঁচল ধরিয়া টানিল। নিমেষ মধ্যে যুবতী অর্দ্ধোলঙ্গা; আর

একটি পাষণ্ড তাহার মুখে হাত দিতে চেষ্টা করিতেছে দেখিয়া, বিকট চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। সেই অভ্রভেদী হৃদয়-বিদারক চীৎকারে যুবতীর মাতা পিতার সহিত সদর-গৃহ হইতে পাঁচ ছয় জন লোক ঝম্প প্রদানে বাহির হইয়া রন্ধনশালায় প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল. তাহাতে হতজ্ঞান হইল না, বরং পাষণ্ডদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য কোমরে কাপড় জড়াইয়া রীতিমত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দুই পক্ষেই লাঠিতে লাঠিতে আঘাত করিয়া এরূপ ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে লাগিল যে, দুর্ব্বৃত্তেরা এরূপ সাহসী ও কৌশলী লাঠিবাজদের আকস্মিক আবির্ভাবে বিষম প্রমাদ গণিল। এই ঘোরতর যুদ্ধের অবসান না হইতে পৃষ্ঠভঙ্গ দেওয়াই বিধেয় বলিয়া মনে হইলেও অপমানের খাতিরে অথবা প্রাণের ভয়ে তাহাও তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হর্‌দম্‌ যুদ্ধ চলিতে লাগিল; কাহারও জয়-পরাজয়ের লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। যুবতী পক্ষ ধীর-স্থির ভাবে লাঠি ঘুরাইতে লাগিল; ক্রমে ক্রমে তাহাদের তেজ-বীর্য্য-বিক্রম অধিক হইতে অধিকতর দৃষ্ট হইতে লাগিল। অশিক্ষিত গ্রাম্য দুর্ব্বৃত্ত যুবকেরা আর অধিকক্ষণ তাহাদের লাঠির ঘুরে তিষ্ঠিতে পারিল না। হঠাৎ দুর্ব্বৃত্ত-দলপতির কর্ণে জনৈক লাঠিবাজের লাঠির আঘাতে কর্ণমূল পর্য্যন্ত উৎপাটিত হইয়া গেল। সে দুই হাতে কান চাপিয়া প্রাণের ভয়ে পলায়নে উদ্যত হইতেছে দেখিয়া অনুচরবর্গও হাতের লাঠি মাটীতে ফেলিয়া. তাহার অনুসরণ করিতে বাধ্য হইল। এ দিকে শাস্তি দেওয়ার উপযুক্ত সুযোগ যায় মনে করিয়া যুবতী পক্ষ প্রত্যেক পলায়নকারীর পৃষ্ঠে কাঁধে দু'এক ঘা দিয়া দৌড়ের বেগ কমাইয়া দিল। এবং সুযোগ মত দু'চারিটিকে হাতে পায়ে বাঁধিয়াও ফেলিল।

এখন, যুবতী পক্ষে যুদ্ধকারীদের সহিত আমাদের পরিচিত হওয়া

বিশেষ বাঞ্ছনীয়। শক্তিপুর নিবাসী আলতাফ আলী খান্ একজন প্রতিপত্তিশালী লোক। সমাজে তাঁহার আধিপত্য প্রায় একজন নিম-জমিদারের মতই। বাড়ী চাকর-নকরে ভরপুর, সর্ব্বদাই কোন না কোন প্রয়োজনীয় কার্য্যের জন্য পাইক-পেয়াদা লাগিয়াই আছে। বিশেষতঃ কয়েক দিন পূর্ব্বে একটি তালুকের আট আনা অংশ খরিদ করিয়া তাহার দখল লওয়ার জন্য কয়েকটি লাঠিবাজ পেয়াদার প্রয়োজন হয়। তাই কুতুবপুর হইতে তিনি পাঁচটী বিখ্যাত লাঠিবাজ পেয়াদা আনাইয়া নিজ বাড়ীতে রাখিয়া দিয়াছেন। ইহারা সদাসর্ব্বদা খান সাহেবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। হরিপুর গ্রামটী খান সাহেবের পত্তনীর অন্তর্গত এবং দুলাল গাজী তাঁহার প্রজা। তিনি বাৎসরিক খাজানা ওয়াশিলের জন্য যখন মফঃস্বলে যান, তখন হরিপুরের আদায় তহশীলের জন্য দুলাল গাজীর বাড়ীতেই কাছারী করিয়া থাকেন। অদ্য তাই, পাইক পেয়াদা সঙ্গে করিয়া হরিপুরে দুলাল গাজীর বাড়ীতে রাত্রি একাদশ ঘটিকার সময় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার আগমন সংবাদ ঐ বাড়ীর লোক ছাড়া অন্য কেহ এখনও জানিতে পারে নাই। তাহাদিগকে সদর-গৃহে স্থান দিয়া দুলাল গাজীর স্ত্রী পান-সুপারী প্রস্তুত করিতেছে। আর দুলাল গাজী স্বয়ং মনীব ও অন্যান্য লোক-জনের অনেক পথভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি পাখার বাতাসে দূরীভূত করিতেছে। যে পর্য্যন্ত তাহাদের ঘর্ম্মে সিক্ত-শরীর শুষ্ক না হইল, সে পর্য্যন্ত তাঁহারা নীরবে শুইয়া রহিল। এই সময়েই দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে দুলাল গাজীর যুবতী কন্যা চীৎকার করায়, খান সাহেবের কুতুবপুরী পেয়াদারা ছুটিয়া যাইয়া কিরূপ নিপুণতার সহিত অবলার ইজ্জত রক্ষা করিয়াছিল, তাহা আবার বলিয়া ফল কি?

এখন খান সাহেবের পায়ে পড়িয়া দুলাল গাজী বর্ত্তমান বিপদের

কথা নিবেদন করিতে লাগিল। খান সাহেব কাগজ কলম বাহির করিয়া একে একে দুর্বৃত্তদের নামের এক লিষ্টি তৈয়ারী করিয়া প্রত্যুষেই একখানা পত্র সহ জনৈক পেয়াদাকে থানায় পাঠাইয়া দিলেন এ দিকে দুলাল গাজীর বৃদ্ধা স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে পারিলেন যে, কন্যার স্বাস্থ্য ভালই আছে। পাষণ্ডদের স্পর্শমাত্রই সে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গিয়াছিল পর কি সংঘটিত হইয়াছে সে তাহা বলিতে পারে না। বলিতে বলিতে প্রাণপণে দৌড়িয়া আসিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে পেয়াদা খবর দিল যে তিন চারটা পুলিশ ঘোড়ায় আরোহণ করিয়া আসিতেছে। আর লাঠি সমভিব্যাহারে গণ্ডায় গণ্ডায় কনষ্টবল পথ ধরিয়াছে। পত্র দেওয়া মাত্র থানাতে যেন আগুন জ্বলিয়া উঠিল। সে আরও বলিল, "আমি এই সব দেইখা আর ভয়ে তথায় তিষ্টিতে পারলাম না, আরে বাপ্, এখনও আমার বুক ধড়ফড় করতে আছে।" এমন সময় দুম্‌দাম্, সোঁ সোঁ দিগন্তব্যাপী ঝড়ের মত পুলিশ, কনষ্টবল দুলালগাজির বাড়ী ছাইয়া ফেলিল। চারিদিক হইতে কেবল ধর্‌মার্ শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল। নিকটবর্ত্তী বাড়ীর লোক এমন কি দূরবর্ত্তী লোকেরাও নিজ নিজ স্ত্রী-কন্যাকে আত্মীয় স্বজনের বাড়ীতে পাঠাইয়া দিয়া পুলিশী অত্যাচার হইতে নিরাপদ হইতে লাগিল। কেহ বা দৌড়িয়া যেখানে স্থান পাইল, সেখানেই বন্য পশুর মত পলায়ন করিতে লাগিল। তথাপি পুলিশের দল শিকারীর মত বন-জঙ্গল হইতে পলাতকদিগকে অনুসন্ধান করিয়া অমানুষিক অত্যাচার করিতে লাগিল তাহাদের প্রাথমিক উন্মাদনার নিবৃত্তি হইলে, 'ইয়াফ্‌তির' দিকে মনোযোগ দিল। অবশেষে হায়দর পহল্‌ওয়ানের হাতে হাত-কড়া লাগাইয়া টানিয়া চলিল। ছেলের বন্ধনদশায় মাতা আসিয়া পুলিশকে কত বাবা

ডাকিল; কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না। ধাক্কাইতে ধাক্কাইতে শ্রীমান্‌কে জমাদার বাড়ীতে উপস্থিত করিল। বাড়ীর কর্ত্তা জমাদারকে দেখিতে পাইয়া তাহার হাতেও কড়া লাগাইবার আদেশ করিয়া দারোগা বাবু সিগার মুখে ঢুকাইয়া নাসিকাতে ধুম্রোদ্‌গার করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। তদ্দর্শনে জমাদার করযোড়ে বলিয়া উঠিল, "দোহাই মহারাণীর, আমি কোন অপরাধ করি নাই।" দারোগা বাবু পকেট হইতে একখানা কাগজ বাহির করিয়া লানতুল্লার নাম উচ্চারণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন। লানতুল্লার নাম শুনিয়া জমাদার উপস্থিত খান সাহেবের পায়ে ধরিয়া বলিল, "বাবা, আপ্‌নি ভিন্ন আর সম্মান কে রক্ষা কর্‌বে? আপ্‌নিই এখন্‌ হর্ত্তা-কর্ত্তা। রক্ষা করুন, বাবা, এ বিপদে।" খান্‌ সাহেব বলিলেন, "তুমি অস্থির হয়ো না, অন্যায় করিয়া থাকিলে পুত্র কেন, তুমি স্বয়ংও নিষ্কৃতি পাবে না। আমি দারোগা বাবুর অনুরোধে সঙ্গে আসিয়াছি মাত্র, এরূপ ঘোরতর বিষয়ে আমার কি হাত আছে? তবে তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর, দারোগা বাবুর সহিত পরামর্শ করিয়া করিতে পার, আমার কোন আপত্তি নাই।"

অতঃপর নানাবিধ বাকবিতণ্ডায় সকলেই স্থির ভাবে বসিল। দারোগা বাবু চক্ষু ঘুরাইয়া বলিলেন, "কোন শালাকেই ছাড়্‌ছি না, শালাদের মাগ-ভগ্নী সবশুদ্ধ থানায় গোলাজাত কর্‌ব, তবে ছাড়্‌ব। বদ্‌মায়েসের বাপের শ্রাদ্ধ করি।" যাহা হউক অনেক পা ধরাধরির পর সাব্যস্ত হইল যে প্রত্যেক আসামীর জন্য এক শত টাকা করিয়া জমা দিলে আজ গ্রেপ্তার বন্ধ থাকিতে পারে। নতুবা যে কাহাকেও পাওয়া যায় আজই বেপর্‌ওয়া থানায় চালান দেওয়া হইবে। দারোগা বাবু পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন, জমাদার ব্যতীত আর

কেহই আজ এত টাকা নগদ দিতে পারিবে না। তাই পুলিশী বুদ্ধির চাল চালিয়া সর্ব্বাগ্রে লানতুল্লাকেই গ্রেপ্তার করিয়া বসিয়াছিলেন। জমাদার, তাহার মত ধনীর পুত্রকে হাতকড়ায় আবদ্ধ করিয়া জেলে পুরিয়া রাখিবে, তাহা সহ্য করিতে পারিল না। সকল আসামীর দরুণ নিজে গৃহ হইতে হাজার টাকা পুলিশকে উৎকোচ দিয়া অদ্যকার জন্য পুত্রকে কারাবাস হইতে রক্ষা করিল। পুলিস সন্তুষ্ট হইয়া জিম্মা রাখিয়া চলিয়া গেল। পরবর্ত্তী মাসে হাজির হওয়ার তারিখ নির্দ্ধারিত হইল। দারোগা বাবু চলিয়া গেলে, উপস্থিত গ্রেপ্তারি সম্বন্ধে খান সাহেবের সহিত জমাদারের আলাপ চলিতে লাগিল। খান সাহেব ব্যঙ্গস্বরে বলিলেন, "জমাদার সাব, এবার সহজে মুক্তি পাওয়ার যো নাই, মেয়েটীই স্বয়ং সাক্ষী কিনা! তাহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই বোধ হয় মামলা হাল্‌কা হইয়া পড়িবে। তবে— অপরিণীতা মেয়ের ইজ্জতের উপর আঘাত, সহজে স্বীকৃত হইবে বলিয়া মনে হয় না। চেষ্টা করিয়া দেখা যাইতে পারে, আমার তাহাতে কোন আপত্তি নাই, আগেও বলিয়াছি।" জমাদার মিনতি করিয়া বলিল, "হুজুর, সবই এহন্ আপনার হাতে। বরাবরই আম্‌রা আপ্‌নার কেনা গোলাম আছি। অসৎ পুত্র নিয়া ঠেকা হইয়াছে, বাবা। রক্ষা চাই এবার। বাদিনীর পিতাও আপনার রায়ত। আপনার কথা না শুইনা তারা কিছুই কর্‌তে পারে না। আপনি অনুগ্যাহর কল্লেই এ হতভাগাদের ইজ্জত রক্ষা হয়।" খান সাহেব অনেকক্ষণ যাবত ইত্যাকার কথা শুনিতে শুনিতে কাণ বধির করিয়া তুলিয়াছেন। তাই জমাদারের শেষোক্ত কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন, "ইজ্জতের কথা নিয়া বাড়াবাড়ি নিষ্প্রয়োজন। আমি এখনও এরূপ পশুত্ব প্রাপ্ত হই নাই যে, অবলার ইজ্জত হইতে পুরুষের ইজ্জতকে

বেশী মনে করিব। খোদাও যেন এ কথা না শুনুন; আমারও মন হইতে এরূপ ধারণা চিরতরে দূরীভূত হউক। জানি না কালের কি অবিচারের দরুণ আমাকে এসব কথা শুনতে হচ্ছে।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি উত্তেজনার সহিত কাণে হাত স্পর্শ করিয়া ঘৃণার সহিত তথা হইতে প্রস্থানের উদ্যোগ করিলেন। জমাদার পায়ে পড়িয়া কান্নাকাটি করায়, "আচ্ছা, দেখা যাউক, এখন চল্লাম" বলিয়া গন্তব্য স্থানে চলিয়া গেলেন। সকলেই যার যার স্থানে, কেহ সগর্ব্বে, কেহ বা সভয়ে প্রস্থান করিল; কেবল গেল না জমাদার ও তাহার পুত্র লালতুল্লা। নিরাশ ভাবে সেখানেই তাহারা বসিয়া রহিল।

প্রায় ঘণ্টা পরিমিত কাল শ্বাস-নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে জমাদার, লালতুল্লা সহ অন্দর বাড়ীতে প্রবেশ করিল। লোহার সিন্দুকের তালা খুলিয়া মাথায় হাত মারিয়া বলিয়া উঠিল, "হায়রে পোড়া কপাল! কার লাইগা এত করেছিলাম? আর কারে সোণার সংসার লুটাইয়া দিলাম? পয়সার জন্যও কত সতী নারীকে অপমান অত্যাচার করেছি, খোদা! আর কি তুমি এ অত্যাচার সহ্য করতে পারলে না? তাকে-তাকে আমার টাকার পূর্ণ থলিয়া পড়ে রয়েছে, কপর্দ্দক ব্যয় করেও কিছুমতকে তৃপ্তি দেই নাই। ছেলেমেয়েকে একটি পয়সার ভাজা বুট কিনে দেই নাই। আহা, সে দিন লাতু আমার, দুটি মাত্র পয়সার খেলনার জন্য বাজারে কতই ঘুরিয়া ঘুরিয়া হাঁফাইয়া কাঁদিল! ঐ বধির অন্ধল দ্বিপ্রহরের ভয়ানক গরম রোদে পড়ে একটা পয়সা ভিক্ষার জন্য কতই না বাবা ডাকিল, অনুনয়-বিনয় করিল; কিন্তু আমার পাষাণ হৃদয় একটুও নরম হইল না, একটি পয়সাও ব্যয় করলাম না। যেমন দুই টাকা নিয়া বাজারে গেলাম, তেমনি দুই টাকা সঙ্গে করে বাড়ীতে ফিরলাম, কপাল! ছারেখারে যা। আর

দুই থলিয়াতে দু'হাজার মাত্র। তাহাও ভাগ্য, সে দিন মেয়েমানুষের গয়নাগুলি বিক্রি করে সুদে লাগাইবার আশায় রেখেছিলাম। এই সামান্য টাকা ত কালই খান্ সাহেবের মুখ বন্ধ করতে নিঃশেষ হবে। আর কি চাই? আর চাই ভিক্ষার ঝুলি! গাঁয়ে গাঁয়ে ভিক্ষা করে জীবনযাপন করা, নতুবা উদর নিষ্পত্তি হবে না। (লানতুল্লার দিকে দৃষ্টি করিয়া) যা, যা হতভাগা, দূর হ দানব, আমার চক্ষুর সামন্ থেকে অনেক দূরে সরে যা। তোকে দেখবার সাধ মিটে গেছে। আর দেখ্তে ইচ্ছা হয় না। তুই খুবই আদরের ছিলি, তাই তাহা করেছি, এখন সব আদর শেষ হয়েছে; আর আদর করা ভাল ঠেকে'না। যেমন পরের অপমান করেছিস্, তেমন পরদ্বারা অপমানিত হ গে। তাতে আমার কোন আপত্তি নাই; বরং খুসী। খুব খুসী! বড় খুসী!!" সর্ব্বপ্রথম পিতার এই গরম কথা শুনিয়া ও উত্তেজিত ভাব দেখিয়া লানতুল্লার প্রাণ ভাঙ্গিয়া গেল। আশা ভরসা, সাহস-বীর্য্য সব যেন কোথায় চলিয়া গেল। সে নিরাশনেত্রে পিতার মুখেরদিকে চাহিয়া কান্দিয়া বলিল, "বাবা, চল্লাম বাড়ী হতে। আপনার যা ইচ্ছে কর্তে পারেন। পরশু একবার দারোগা পথে চোক রাঙ্গাইয়া ধম্কাইছে; তাতে আজ তক্ আমার পরাণ কাঁপ্তে আছে। আবার আজ আপ্নি ধমকান্ চক্ষে যদ্দূর পথ দেহি, তদ্দূরই চলিয়া যাইব।" এই বলিয়া সে রাগে, রোষে, ক্ষোভে, দুঃখে ও অভিমানে গৃহ হইতে থপ্ থপ্ পদবিক্ষেপে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

পুত্র গৃহ হইতে বহির্গত হইলে, জমাদার আক্ষেপের সহিত বলিতে লাগিল, 'এখন আমার বল্বার অধিকার নাই! সে অধিকার অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। আলালের ঘরের দুলাল্, যখন তুমি আমার মাথার উপর দশ খেলেছ, তখনও তোমাকে কিছু বলি নাই। যদি

বা কেহ কিছু বলেছে, ওরে বাবা, আমি রাগিয়া আগুন হয়েছি। আমার ভয়ে তোর পায়ে ধরে মাপ চাহিয়েছে। আজ তার উপযুক্ত প্রতিদান। পরিতাপ! পরিতাপ!! আর সহ্য হয় না। খোদা! মুহূর্ত্তমধ্যে এজীবনের অন্তিমকাল উপস্থিত করে পরিতাপের নিবৃত্তি কর্। জ্বালা! জ্বালা!! আর যে বাঁচি না। তবে কি অর্থ ব্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে পুত্রবাৎসল্যও ব্যয় হয়ে গেল? হায়রে অর্থ, তোর এত মোহিনী শক্তি! তাইত এখন আর পূর্ব্বের মত ছেলেমেয়ের প্রতি দয়া হয় না, কিছুই ভাল লাগে না। তবে কোন্টী বেশী? অর্থ-লালসা? না পুত্রবাৎসল্য? কোনটীই বা কম, আবার কোন্টীই বা বেশী! কিছুই ঠিক কর্তে পারতেছি না যে। সর, সর, এখানে যে যে আছ সর। সরিয়া যাও, আমার মাথা ঘুর্তেছে। বমন আসে, ওয়াক্—।" জমাদারের মাথা ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ মাটীতে পড়িয়া গেল। উপস্থিত লোকজন চাহিয়া দেখিল তাহার সংজ্ঞা নাই। স্ত্রী-কন্যা হাহাকারে কাঁদিতে কাঁদিতে গৃহ হইতে বাহির হইয়া গেল। এই সোর-গোলের সুযোগে লানতুল্লা ঘরে প্রবেশ করিয়া সিন্দুকের মধ্য হইতে দুই হাতে দুইটি টাকার থলিয়াই লইয়া নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল। যাওয়ার সময় কেবল সংজ্ঞাহীন পিতার দিকে একবার বক্রদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়াছিল। যা, যারে মূঢ়; জন্মদাতা, যার উপলক্ষে তোর এ রক্ত-মাংসের শরীর, দুনিয়া দেখিলি যার গুণে, সেই পিতার বিপদ সময়েও স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না! তুচ্ছ মানবকুলে জন্ম তোর। স্মরণ রাখিস্, পিশাচ্, তোর এ ঘোরতর অন্যায়ের পরিণাম অতি সন্নিকট; আর বেশী দিন অপেক্ষা করিতে হইবে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

বে-আইনি ওয়ারেণ্ট্।

আজ শুক্রবার। বেলা দ্বাদশ ঘটিকা অতিক্রম করে নাই। ছালেনা এখনও তাহার মাম-বাড়ীতেই আছে। প্রথমতঃ বিমাতার অকাল মৃত্যুতে যেরূপ শোকাভিভূতা হইয়া পড়িয়াছিল, তাহা স্থায়ী থাকিলে একটা মানুষের পক্ষে জীবনধারণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিত। কিন্তু সে শোক ক্রমে ক্রমে তিরোহিত হইয়া গেল। "জুম্মার দিন ভাল পোষাক্ পর্লে ছোয়াব্ হয়" এই মন্ত্র বালিকা এখনও ভুলে নাই। তাহার যে ভাল কাপড়চোপড় আছে, তাহাই পরিধান করিয়া প্রফুল্লবদনে একটা আয়নাবদ্ধ আল্মারীতে সজ্জিত কেতাবের সুন্দর সুন্দর মলাট দেখিতেছে। আর মাঝে মাঝে যেন এক এক খানাকে পছন্দ মত আঙ্গুল দিয়া আয়নার উপরেই চিহ্নিত করিতেছে। কিন্তু আল্মারী তালাবদ্ধ বলিয়া কিছুই খুলিয়া দেখিতে পারিতেছে না।

এমন সময় একটি যুবক - এই মাত্র গোঁপশ্মশ্রু দেখা দিয়াছে, তাহাতে যেন পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে মেঘহীন পরিষ্কার আকাশের প্রকৃত নীলাভা ঝক্ঝক্ করিয়া শোভিত হইতেছে—দরজায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। বাস্তবিক যুবকের এ সুন্দর চেহেরায়, সদ্যস্ফুরিত গোঁপরাজি, এক স্বর্গের সুষমা মাখিয়া রাখিয়াছিল। সে খানকতক সুন্দর মলাটের নূতন পুস্তক হাতে করিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াই আর অগ্রসর হইতে পারিল না। সম্মুখে এক অনুপম রূপসী যুবতী দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিল, এ কে? অযাচিত ভাবে এমন

নূরের তৈয়ারী 'হুর' আমার এই নগণ্য আল্‌মারীর সাজ-সজ্জা দেখিবার জন্য এইটি কার অনুগ্রহ হইল?" বালিকাও একদিক হইতে চক্ষু ঘুরাইয়া অন্যদিকে তাকাইতেই এক অনিন্দ্যসুন্দর যুবকের চেহারা আলমারীর উপর প্রতিফলিত হইয়াছে দেখিয়া চমকিত হইয়া উঠিল। সে দেখিল, যুবকের পরণে ইস্তারি-করা একখানা ধব্‌ধবে সাদা তহবন্, গায়ে চুড়ীদার আস্তিনের পাঞ্জাবী পিরহান্, পায়ে কালবার্নিশের একজোড়া স্লীপার, আর মাথায় লাল টাট্‌কা রংএর একটি তুর্কী টুপী। তৃষ্ণাতুর যে প্রকার জলের প্রতি ক্ষণকাল অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে, যুবতীও তেমতি আজ যুবকের প্রতিমূর্ত্তির দিকে ক্ষণকাল একাগ্রতার সহিত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যেন কোনও কালের বাসনা-নিবৃত্তি করিয়া লইল। এত দীর্ঘকাল পরেও, একবার দর্পণে যে ছবি অবলোকন করিয়াছিল, তাহা তাহার মনে উজ্জ্বলভাবে উদিত হইতে লাগিল। সে ভাবিল, এ দর্পণ-মূর্ত্তি একবার বিস্মৃতি গর্ভে পতিত হইয়াছিল, আবার ভুলা-কথা জাগাইয়া দিল। আমি ইহাকে ভুলিতে পারিব না।" হঠাৎ পশ্চাৎ দিকে অবলোকন করিয়া আর যুবতী তথায় থাকিতে পারিল না। সে যেন অফুরন্ত হাসির ফোয়ারা হইতে নিতান্ত কৃপণের মত সামান্য কিছু হাসি হাসিয়া উঠিল এবং লজ্জার খাতিরে আবদার করিতে করিতে তথা হইতে সরিয়া পড়িল। এখন যুবক একাকী। সে ভাবিল, "একি হাসিল, না বিজ্‌লী চম্‌কিয়া গেল? হাসির অনন্ত ভাণ্ডার হতে যেন একটু ক্ষীণ হাসি মাত্র হাসিয়া গেল। আমি আর সইতে পারি না; এ চিত্তাকর্ষকরূপে মুগ্ধ না হয়ে থাক্‌তে পারব না। তবে এ কি সে? তাহা বুঝাও ত আমার পক্ষে দুষ্কর। তার ঐ স্বর্গীয় হাসাচ্ছটাতে চক্ষে ধাঁধা লাগিয়া গেল যে!! সে না হলে, আবার এখানে কে-ই বা আসতে পারে? যদি সে-ই হয় তবে

কেন আর-আর দিনের মত 'ভাই-ছাব, ভাই-ছাব' বলে পাঞ্জাবীর পকেট পরীক্ষা করল না?" আধঘণ্টা যাবত ইত্যাকার ভাবনা তাহার মনের উপর দিয়া প্রবাহ খেলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে যুবতীও দুই তিন বার যুবকের এ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছে, অন্য কথা 'কাকস্য'। কিন্তু যুবকের তাহাতে ভ্রূক্ষেপও নাই। এই চিন্তাস্রোত ভঙ্গ করিয়া বাড়ীর বৈঠকখানা হইতে কে ডাকিল, "বাড়ীতে কে আছে?" তিন ডাকের পরে যুবকের জ্ঞান হইল; সে বইগুলি হাতে করিয়াই পূর্ব্ব-পরিহিত পোষাকে বাহির বাড়ীতে রওয়ানা হইল। দূর হইতেই তাহার পূর্ব্বপরিচিত বন্ধু ইব্রাহিম দারোগা তাহাকে দেখিয়া হাসিতে হাসিতে তাহার দিকে অগ্রসর হইল। নিকটবর্ত্তী হইলেই দারোগা "আদাব, মৌলবী সাহেব" বলিয়া যুবকের সহিত করমর্দ্দন করিল। দুইজনই গলাগলি করিয়া অন্দর বাড়ী চলিয়া গেল। লানতুল্লার বাড়ীর চাকর নৈমদ্দি ও দুইজন কনেষ্টবল বৈঠকখানায় বসিয়া রহিল।

দারোগা—আজ কি আপনাদের কলেজ বন্ধ, মৌলবী সা'ব?

যুবক—না, এই যে আসলাম। আজ এক ঘণ্টার লিকচার, পৌণে বারটাতেই ছুটী, বিশেষতঃ জুম্মার দিন, তাই একটু সকালেই এসেছি।

দারোগা—আপনাদের পরীক্ষা কবে ঠিক হল? বোধ হয় তিন চার মাস বাকী, না?

যুবক—হাঁ, অনুমান তাই। তবে ফাইন্যাল মাদ্রাসা পরীক্ষার কিছু পরেই সাধারণতঃ বি-এ পরীক্ষা হইয়ে থাকে। শুনলাম এবার নাকি মাদ্রাসা-পরীক্ষা আমাদের পরেই হবে।

দারোগা—আপনাদের সময়ে ত আমার মনে হয় যেন এক সঙ্গে পরীক্ষা হইয়েছিল।

যুবক—তা ঠিক। আমি যেবার ফাইন্যাল মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ

করি, সেই হতেই আর এক সঙ্গে হইতে দেখা যায় না। যাক, দোয়া কর্‌বেন দারোগা সা'ব, এবার বড় ভয়।

দারোগা—(হাসিয়া) দোয়া ত আপ্‌নি স্বয়ংই। আমরা কিনা সরকারের ইংরেজী বিদ্যায় পারদর্শী প্রভুভক্ত কুকুর! দোয়া কর্‌বার স্বাধীনতাই বা আমাদের কোথায়?

যুবক—কেন? ইংরেজী-শিক্ষিত হইলেই যে দোয়া কর্ত্তে অক্ষম বা অনুপযুক্ত সে কেমন কথা! আমি যে আপনার উপ্‌রেও দুই ধাপ। তাহলে আমিই বা উপযুক্ত কিসে?

দারোগা—আপনি ত আমাদের উপর বরাবরই। মাদ্রাসা-পরীক্ষার সঙ্গেই খোদার-নাম-কালাম-শিক্ষা ইতি করেছেন; আর আমরা যে কি বড় আলেম, সে কথা বল্‌ব না।. তাহলে আপনি আবার নীচে পড়্‌বেন। এই গেল শিক্ষার কথা; বয়সে ত দাদা আছেনই। আবার তার উপর ললনাভুলান সৌন্দর্য্যেও আমার ডাব্‌ল্।

যুবক—ললনাভুলান কেন, এ রকম জগৎভুলান সৌন্দর্য্য থাক্‌লেই বা কি আসে যায়!

দারোগা— কেন?

যুবক—তা আপনিই অনুমান করুন, কেন?

দারোগা—আমি অনুমান কর্‌ব? তবে শুনুন্ স্বয়ং উপস্থিত হয়েই আছেন।

যুবক—স্বয়ং কে উপস্থিত আছেন?

দারোগা—যাঁর কথা অনুমান কর্‌লাম!

যুবক—কি অনুমান কর্‌লেন?

দারোগা—নাম শুন্‌তে ইচ্ছে হয়, সুখ বোধ হয় নাকি? তবে বলি শুনুন।

যুবক—রাখুন ভাই , কার নিকট শুনলেন্? কে বল্ল?

দারোগা—আপনার শক্রর নিকট।

যুবক—আমার শক্রর নিকট! সে কি কথা, আমার শক্র আবার কে হ'তে পারে।

দারোগা—আপনার 'তাঁর' প্রণয় আকাঙ্ক্ষাকারী। এরই মধ্যে সব ভু'লে গেলেন?

যুবক—ভুলিনি ভাই, আমার মাথা ঘুর্‌ছে; আপনি কি উপলক্ষে এখানে, কি হয়েছে আমাকে বলুন। হঠাৎ কেন গরিবালয়ে অনুগ্রহ, দারোগা সা'ব?

দারোগা—অনুগ্রহ নহে; বরং নিগ্রহ।

যুবক—কেন, কি নিগ্রহ? কি বল্‌ছেন? কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছি না যে।

দারোগা—তা আর এখন কর্‌লাম কই। আপনার সহিত সাক্ষাতেই সব মাটী হয়ে গেল। ভাগ্যে বড় বাবু আসেন নি।

যুবক—কি কর্‌লেন কই? কি মাটী হইয়ে গেল? বড় বাবুই বা এখানে আস্‌বেন কেন, ভাই?

দারোগা—এরেষ্ট্।

যুবক—এরেষ্ট্! কাকে এরেষ্ট্?

দারোগা—লানতুল্লার চক্রান্তে—ছালেমাকে।

যুবক—আমায় একটু চিন্তা কর্‌বার অবসর দিন্। আচ্ছা, সব বুঝ্‌লাম। দুর্ব্বৃত্ত এখন কোথায়, দারুগা বাবু, না, দার' সা'ব?

দারোগা—ভয়ে এতদূর পর্য্যন্ত আসে নাই। তার চাকর নইমদ্দিকে পাঠিয়ে দিয়েছে। ঐ যে সে আপ্‌নার বৈঠক খানায় চটে বসে আছে।

এখানেই কথোপকথন সমাপ্ত করিয়া দারোগা, যুবকের সহিত

করমর্দ্দন করিয়া প্রস্থান করিবার উদ্যোগ করিল। যুবক তখন সাহসে ভর করিয়া বলিল, "আচ্ছা ভাই, এরেষ্ট্‌টা কি অজুহাতে?"

দারোগা—ঋণের জন্য।

যুবক—কার ঋণের জন্য?

দারোগা—পিতার ঋণের জন্য। Your would-be father-in-law's.

যুবক—পিতার ঋণের জন্য কন্যা গ্রেপ্তার! অমানুষিক অত্যাচার, অমানুষিক অত্যাচার!! পাশবিক বল প্রয়োগ, নয় কি দারোগা সা'ব? নারী জাতির প্রতি বে-আইনি ওয়ারেণ্ট।

দারোগা—তা ঠিক, আপনার কোন চিন্তা নাই। আপনি নিশ্চিন্ত মনে পরীক্ষার জন্য তৈরী হতে থাকুন। যা'তে কোনো অপমান-অন্যায় না হতে পারে তজ্জন্য আমি অভিভাবক নিযুক্ত হলেম। বুঝ্‌লেন ত? যান।

দারোগা বাহির বাড়ীতে আসিয়া অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া চটক মারিল। অশ্ব প্রভুর ইঙ্গিতে বেগে ধাবিত হইতে লাগিল। এদিকে যুবক অন্দরে প্রবেশ করিয়া নাকে মুখে দুচার গ্রাস্ পুরিয়া তাড়াতাড়ি জুম্মার নমাজে যোগদান করিতে গেল।

আমাদের এ আখ্যায়িকার যুবকও দারোগার পরিচয় যথাসময় আপনাদের গোচর করিব। এখনই সময় নষ্ট করিয়া ফল কি? যাহা হউক, দারোগা এখনও থানায় উপস্থিত হয় নাই। পথে যাইতে মাথা নাড়িয়া চিন্তা বাহির করিতেছিল, থানায় কি কৈফিয়ত দেওয়া যায়; আর লানতুল্লাকেই বা কি যুক্তিসঙ্গত ফাঁকি দেওয়া যায়। অবশেষে অতি কষ্টে বাস্তবিকই একটি ধূর্ত্তামীর ফন্দি তৈয়ার করিয়া লইল। থানায় পঁহুছিতে আর বিশেষ বিলম্ব নাই, সম্মুখ বক্র রাস্তা অতিক্রম করিলেই থানা দৃষ্টিগোচর হয়। তাই অশ্বের বেগ

কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া চলিবে স্থির করিয়া বল্গা ধরিয়া টানিল, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে লানতুল্লা হঠাৎ পার্শ্বস্থ ঝোপের অভ্যন্তর হইতে মাথা বাহির করিয়া "বাবু সেলাম" বলিয়া করযোড়ে দণ্ডায়মান হইল। হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর হইতে একটা কি সশব্দে মস্তক উত্তোলন করিয়াছে দেখিয়া অশ্ব চমকিত হইয়া পথচ্যুত হইয়া গেল। দারোগা অতি কষ্টে অশ্বকে সংযত করিয়া লানতুল্লাকে বলিয়া উঠিল, "শালা গরু-চোর, জঙ্গলে কিসের আড্ডা রে! এখনি থানায় চালান দেব।" অমনি লানতুল্লা জামার পকেটে হাত গুজাইয়া দারোগার দিকে অগ্রসর হইতেই তাহার ক্রোধান্ধ চক্ষু একেবারে অমায়িকতায় ও পরোপকারে পরিষ্কার হইয়া আসিল। দারোগা যেন এই মাত্র দেখিল এ যে লানতুল্লা। আর নিজের হাত বাড়াইয়া কি যেন খুব যত্নের সহিত স্বীয় পকেটে রাখিয়া দিল। লানতুল্লাও কি বলিবার জন্য দুই পদ অগ্রবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইল।

দারোগা—কি বলবে বল হে বাপু, এ পথের মধ্যে তোমাকে দেখে, অতি কষ্টে ঘোড়া থামাতে হচ্ছে।

লানতুল্লা—বাবু, দেহা হইছিল?

দারোগা—বাপু, আমরা কি পরের মেয়েলোক দেখবার জন্য যাই? বড় মজার কথা বল দেখি!

লানতুল্লা—তা কি আর হয়? গেরেপ্তারের কি? থানায় আনা হবে না?

দারোগা—থানায় ত আনা হবে, বাপু, ভদ্রলোকের মেয়ের অযথা গ্রেপ্তার এত সোজা নয়! নিজের চাকুরীই বা শেষে গোল্লায় যায়।

লানতুল্লা—তাইলে বাবু আমার— ?

দারোগা -'তাইলে আমায়' আর কি? পরিশ্রম আছে, হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম।

লানতুল্লা—আমি ত পারিশ্রমিক যৎসামান্য—।

দারোগা—শালার বেটা, তোর পারিশ্রমিক ফিরাইয়া নে। এক ঢিলে দুই পাখী মারা—রথ দেখা, কলা বেচা। না?

লানতুল্লা—তবে ব'লে দিলে আমি—।

দারোগা—শুন্ বেটা, আমরা বলাবলির ধার ধারি না। কবেই বা কাকে কি বলে দেই? হাতে পেলে, কম হউক, বেশী হউক, সম্ভব, অসম্ভব বুঝিয়া দেখি। সেদিন শুনেছি জজ সাহেব তোমাদের ষড়যন্ত্র বুঝ্তে পেরেছেন; অতি সত্বর তোমাদের মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ করে তোমাদেরই তলব দিবেন। যা কর্তে হয় সত্বর, আমি এখন চল্লাম।

এই বলিয়া দারোগা ঘোড়া ছাড়িয়া চলিয়া গেল। লানতুল্লা তথায় একাকী দাঁড়াইয়া ভাবিল, "তবে ৫০০৲ পাঁচ শত আর এই মাত্র যে ৫০ পঞ্চাশ টাকা দেওয়া হল, তাতে কোন ফলোদয় হইল না? হায় রে অর্থ তুমি মানুষকে কি না করিতে পার? তুমি নিমিষে সজলনেত্রে ক্রোধ আনিতে পার, কঠিন প্রাণ তরল করিতে পার, শুষ্ক প্রাণ শীতল করিতে পার, রাজাকে ভিখারী করিতে পার, ভিখারীকে রাজা করিতে পার, তুমি বন্ধুকে পরম শত্রু, পরম শত্রুকে বুকের বন্ধু করিতে পার। মৃতেও কি তুমি জীবন দান করিতে পার? হায় রে লজ্জাহীন অর্থ! এতই যদি লজ্জাহীন, তবে কেন আগে ইঙ্গিত করিলে না? জানি না দয়াময়, তোমার কি অভিপ্রায়? স্বোপার্জ্জিত অর্থ যাহা ছিল, সব পুলিশকে দিয়াই শেষ হইয়া গেল। ঐ দিকে দাঙ্গাহাঙ্গামার মোকদ্দমাটাও নাকি খুব সঙ্গীন্ হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া শুনেছি। তাহাতে সরকারী তহবিল হইতে দশ হাজারে বিশ হাজারে খরচ হইতেছে। সরকারী তহবিল হইতে আর এক

কপর্দ্দকও পাওয়ার যোগাড় নাই। তবে কি এখানেই সব পণ্ড হইয়া যাইবে? এত ব্যয়, অজস্র পরিশ্রমের পর কি করিয়াই বা নীরব থাকা সম্ভব হয়! আপাততঃ আমার খোদ তহবিলের লগ্নিতের যে টাকা খাতকের নিকট আছে, তাহাই ব্যয় করিতে হইবে। খাতকেরা এখন টাকা দিবে কি না, দিতে পারে কি না, তাহাও ত চিন্তার বিষয়। টাকা না হইলেও নয়। সমস্ত সুদ মাইর দিলেও টাকা পরিশোধ করবে না? শালাদের ঘাড়ে করবে। না দিলে কাণ দুইটা ধরিয়া টাকা আদায় করব।" এই শেষোক্তিতে লানতুল্লা ভাবের উচ্ছ্বাসে নিজের কর্ণ-লতিকা ধরিয়া জোরে টানিল। যখন তাহার চৈতন্ত হইল, তখন অদূরেই নৈমদ্দিকে আসিতে দেখিয়া নিজের বোকামী গোপন করিবার জন্ত তাহাকে শুনাইয়া বলিল, "শালার মশা-মাছির অত্যাচারে পথে টিকা ভার। কানের ভিতরেও হাতী প্রবেশ করতে চায়!" চাকর নৈমদ্দি, প্রভুর এ আড়ষ্টতা দেখিয়াও দেখিল না। প্রভু উপ্ প্ প্ করিয়া একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তবে আর কি করে হয় নইম্? রাজাও যদি বিগড়ে যায়, তবে আর সুবিচার কোথায়? আচ্ছা নইম্, ঘুষ ত দিয়াছে বুঝলাম, কিন্তু বলতে পার কি কোন্ স্থানে দিল? একেবারে বিবী-মহলেই সব আদান-প্রদান হয়ে গেল! এ আতরাফে এত টাকাওয়ালা কি করে হল, তাই একবার দেখব। আমার উপরেও কিছু না দিলে আর কি পুলিশ তাহা গ্রহণ করেছে? আচ্ছা দেখা যাউক, অর্থের কত জোর! নগণ্য পিপীলিকা মত্ত মাতঙ্গের সঙ্গে হাতাহাতি করতে চায়। যাও হতভাগা, নিজের বিপদ নিজে ঘটাইলে। যাও নইম্, আজই আমার ফ্রাইভেট্ খাতকদিগকে খবর দেও, টাকার খেলা খেলিতে হইবে। দেখি অদৃষ্টে কি আছে?"

এত আলোচনা—ঝঙ্কার-অহঙ্কারের পর লানতুল্লা থানায়, এবং নৈমদ্দি বাড়ীতে চলিয়া গেল। দারোগা কিন্তু লানতুল্লাকে পথিমধ্যে ভ্রূকুটি মারিয়া বাসায় যাইয়া তাহার প্রতীক্ষায় ওঁৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। এবং পাচককে মাংস-মাছের আশ্বাস দিয়া তৈল-মশলারের বন্দোবস্ত করিবার ইঙ্গিত করিয়াছিল। দারোগার বলিয়া এই কল্পনা ভুল হইতে পারে না। কারণ এই শ্রেণীর কর্ত্তারা যাহা একবার ধারণা করিবেন, তাহা জোরে-জবরে, ছলে-কৌশলে হইলেও সম্পন্ন হইতে হইবে। অনেকক্ষণ যাবত দারোগা বারান্দায় বসিয়া আছে, আজ সকল লোকই থানার দরজা মাড়াইয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছে, কেহই ভিতরে প্রবেশ করিতেছে না। অদূরে দোকানদার মাছ মাংস লইয়া কেহ বা আমের ঝুড়ি মাথায় করিয়া আসিতেছে দেখিলেই সে মনে করে, এরই মধ্যে বোধ হয় যে কোন একটা লানতুল্লা হইবে। কিন্তু তাহা নহে, প্রত্যেকেই থানার পাশ কাটিয়া চলিয়া যাইতেছে, একটিবারও এ দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া চাহিতেছে না। তাই সে ভয়ানক বিরক্ত; মাঝে মাঝে দুই হাতে মস্তক ঘর্ষণ করিয়া ক্রোধ উপশমিত করিতেছে। দৈবদুর্ব্বিপাকে লানতুল্লাকে তখন খালি হাতে থানায় যাইতে দেখিলে স্বহস্তে খাটিয়া নিক্ষেপ করিয়া দূর করিয়া দিবে তাহাও স্থির করিয়া রাখিয়াছে। তাই বুঝি লানতুল্লাও ভাল বুদ্ধি না করিয়া খালি হাতে থানার দিকে আসিতেছিল। তদ্দর্শনে দারোগা মানবমূর্ত্তি পরিহার করিয়া সম্প্রতি দানবমূর্ত্তি বরণ করিয়া লইল। যেই লানতুল্লা ভয়ে ভয়ে নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, অমনি সে সিংহনাদে হুঙ্কারিয়া বলিল, "যাহ্‌ শালা এখন. পেটের চিন্তায় বাঁচি না; মাছ মাংসের গন্ধ নাই ঘরে।" লানতুল্লা ত পথেই আধ-মরা হইয়া পড়িয়াছিল. এখন আবার দারোগার বিকট মুখভঙ্গী ও ধমকে তাহার জীবনের আর অর্দ্ধেক

লইয়া টানাটানি। সে আসিয়াই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিবার যোগাড় করিতেছিল বটে, কিন্তু ভ্রূকুটির গুণে সাহস হারাইয়া, পায়ের অঙ্গুলি টিপিয়া কাঠ-বিড়ালীর মত নিঃশব্দ খুব দ্রুত তথা হইতে প্রস্থান করিল। থানার বাবুর্চ্চিও লানতুল্লার পশ্চাৎ পশ্চাৎ বাজারে চলিয়া গেল। বাজারের সর্ব্বোৎকৃষ্ট মৎস্য কয়টী এক স্থানে জমা করিয়া সে লানতুল্লার কাণে কাণে কি বলিয়া দিলে, সে শীঘ্রই মৎস্য কয়টী খরিদ করিয়া থানায় দিয়া বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু এ মৎস্য-ডালিতে কিছু উপকার হইবে কি? ইহারই কি এত শক্তি যে সে একটা মানুষকে অন্যায় পথে চালিত করিতে পারে? অসম্ভব। মনুষ্যত্বের পরিমাণ সামান্য থাকিলেও সহজে প্রলোভন তাহাকে অসৎ পথে চালিত করিতে পারে না।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

আঁধারে আলো।

সহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে উন্নত মস্তকে মোস্‌লেম কলেজ দণ্ডায়মান। কলেজ গৃহের এক তালা দালান খানি চতুর্দ্দিকে দৃঢ় প্রাচীরে ঘেরাও করা। মাত্র পূর্ব্ব প্রাচীরের গায়ে দুইটী ফটক আছে। ডানদিকের ফটক দ্বারা ভিতরে ঢুকিলে, আফিস এবং প্রিন্সিপাল ও প্রফেসার বাবুদের প্রাইভেট কামরা পাওয়া যায়, আর পাওয়া যায় পোষ্ট গ্রেজুয়েট্ পরীক্ষার্থীদের কার্পেট-মণ্ডিত শ্রেণী-কক্ষ সমূহ। উত্তর দিকের ফটক দ্বারা ইন্‌টারমিডিয়েট্ পরীক্ষার্থীদের শ্রেণীতে যাইতে হয়। এই ফটকের যাত্রীরা পূর্ব্ব কথিত ফটকের যাত্রী অপেক্ষা সাধারণতঃ শারীরিক অবয়বে ও গুরু গাম্ভীর্য্যে যে অনেকটা কম হইবে, তাহা বোধ হয় কল্পনা করিয়াই নেওয়া যায়। কারণ পোষ্ট-গ্রেজুয়েট পরীক্ষার্থীরা দুই বৎসর পূর্ব্বেই এই অপেক্ষাকৃত চঞ্চল-মতি, লীলা ও কৌতুক-প্রিয় দল হইতে সরিয়া পড়িয়াছে। এখন তাহারা গম্ভীর, অল্পভাষী, ও অভিমানী দলে ভুক্ত হইয়াছে। পাছে লোকে বুঝিতে পারে যে তাহারা যথেষ্ট বয়স্ক হইয়াছে, সেই ভয়ে দুই বৎসর পূর্ব্বে যেমন গোঁপ শ্মশ্রুর ধ্বংস সাধন দৈনিক প্রাতঃকৃত্য কর্ম্মের অপরিহার্য্য অংশ ছিল, তেমন আর কেহ এখন সে ভয়ের খাতির করিয়া চলে না। ইত্যবসরে যথেষ্ট প্রণয়-উপন্যাস ও নাটকের শুষ্ক মজ্জা উপভোগ করা হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বা চুয়ালের নীচে ফরাসী কাটে অর্দ্ধ গুচ্ছ দাঁড়ি রাখিয়া দিয়াছে। শিক্ষক-ছাত্রে তুলনা দুষ্কর, কেবল পরিচিত মুখ দেখিয়াই যা একটু সহজসাধ্য।

জীবনের সাথী।

কলেজের সম্মুখেই এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটী স্ফটিক-স্বচ্ছ জলের দীঘি। সম্পূর্ণ কলেজ খানা জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া কানক্ চেক্শনের চিত্রাঙ্কণের যথেষ্ট সাহায্য করিতেছে। কিন্তু পবনের সামান্য অস্থিরতায়ই মূহুর্ত্ত মধ্যে স্থনিপুন ইঞ্জিনিয়ার-হাতে অঙ্কিত সুন্দর-সুরম্য লোহিতবরণ কলেজের নক্সা খানা ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া যায়। আমোদ-প্রিয় ছেলেরা তীরে দাঁড়াইয়া সরোবরে এই সৃষ্টি-প্রলয়ের লীলা প্রলুব্ধলোচনে অবলোকন করিতেছে। এমন সুখের সময়ে ঠন্ ঠন্ করিয়া ঘণ্টা বাজিতে থাকিলে, ছেলেরা দুই ফটকের ভিতর দিয়াই যে যার আগে প্রবেশ লাভ করিতে লাগিল। কাজে কাজেই দরজায় খুব ভিড়, লোকে লোকারণ্য। ঠিক সেই সময় ছেলেদের পশ্চাতে, ফটকের বাহির হইতে মৌলবী আবদুল মন্নান এম্-এ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তৎক্ষণাৎ দারোয়ান বলীরাজ তাহার বিশাল বাহু সঞ্চালনে ছেলেদিগকে দুই দিকে সরাইয়া দিয়া বলিল, "বাবু রাস্তা ছোড়, প্রফেসার ছাব-কো আনে দাও।" পথ পরিষ্কার হইতেই তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন। কলেজের প্রিন্সিপাল দরজায় অগ্রসর হইয়া নবনিযুক্ত প্রফেসারের সহিত হেণ্ড-সেইক্ দিয়া একখানা চেয়ারে বসিতে বলিয়া নিজেও আর এক খানা চেয়ারে চাপিয়া পড়িলেন। আর দু'জনের ভিতর বিবিধ আলাপ চলিল। তাঁদের কেহই সেদিন কোন শ্রেণীর অধ্যাপনা কার্য্য গ্রহণ করিলেন না।

আসুন পাঠক পাঠিকা, আমরাও উপরোক্ত প্রফেসারের সহিত আলাপ করিয়া দেখি তিনি কে। চলুন একবার তাঁহার জীবন-আখ্যায়িকার ভিতর দিয়া বেগে দৌড়িয়া আসি। গরীব ভদ্রলোক মুন্সী মহাম্মদ আব্বাছ খোন্দকারের কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মন্নান স্থানীয় আব্বাছিয়া সিনিয়ার মাদ্রাসায় অধ্যয়নকালে সুবামিয়ার পুত্রের

গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া ফাইন্যাল মাদ্রাসা পরীক্ষায় পাশ করে। সেই তরুণ বয়সেই গবাক্ষের ভিতর দিয়া অপরূপ বেশে সজ্জিতা ছালেমার সুন্দর স্বর্গীয় কান্তি প্রশস্ত দর্পণে প্রতিফলিত দেখিয়া তাহাকেই জীবন-সঙ্গিনী করিয়া রাখিয়াছিল। আবার যখন লানতুল্লার ষড়যন্ত্রে, সরলা যুবতী ঝড়তুফান ও মেঘাচ্ছন্ন দুর্য্যোগ রাত্রিতে অজ্ঞাতসারে অপহৃতা হইতেছিল তখনও এই আবদুল মন্নান হঠাৎ সম্মুখে পড়িয়া সতীর সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিল। কেবল তাহাই নহে; তোষামোদ-খোষামোদে-বধির পুলিশ যখন যুবতীকে বে-আইনি গ্রেপ্তার করিতে যাইয়া তাহার শেষ মানসম্ভ্রমটুকু— নারী-জীবনের শেষ মর্য্যাদা-পর্দ্দাটুকু—কাড়িয়া নিতেছিল, তখনও আবদুল মন্নানের মুখ চাহিয়া, তাহার বাল্য সমপাঠী ইব্রাহিম দারোগা অবলার ইজ্জতে হাত দেয় নাই; বরং তাহাকে নানা প্রকার আশ্বাসবাণী ও অভয় দিয়া থানায় চলিয়া যায়। তবে কি ছালেমার অবশিষ্ট জীবনও তাহার পরম হিতৈষী এ যুবকের হাতেই নিরাপদে কাটিয়া যাইবে? তাইত, সেদিন উভয়ের ছিন্ন প্রাণকে উদ্বাহ-বন্ধনে একত্রিত করা হইল। ফাইন্যাল মাদ্রাসা পাশ করিয়া আবদুল মন্নান একাধারে পাঁচ বৎসর অধ্যয়ন করিয়া এবার এম্-এ পাশ করিল। ইতিমধ্যেই বিধাতার অনুগ্রহে সে সাড়ে তিন শত টাকা বেতনে উক্ত কলেজের পার্শিয়ান প্রফেসারের পদে নিযুক্ত হইল। তাহার কোন পৈত্রিক ঋণ না থাকায় চাকুরী হওয়ার চারি পাঁচ মাস মধ্যেই সে শ্বশুর কাজী আবদুল রসিদ সাহেবের সমস্ত ঋণ পরিশোধ করিয়া দিল এবং অল্পে অল্পে নিজের অবস্থারও উন্নতি করিতে যত্নবান হইল। টাকা পাইয়া কার্ত্তিক সাহা কাজী সাহেবের বন্ধকী-সম্পত্তি ছাড়িয়া দিল। তাহাতে জমাদার ও লানতুল্লার মুখে ছাই পড়িল। আদালতের নোটীশ অনুসারে পুলিশ তৎক্ষণাৎ কাজী আবদুর রসিদ নামে জারী-করা ওয়ারেন্ট প্রত্যাহার করিল।

এতচ্ছ্রবণে কাজী সাহেব যার-পর-নাই কৃতার্থ হইয়া, কি দিয়া নবীন দামাদের এ ঋণ-পাশ হইতে মুক্ত হইবেন, ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না। অবশেষে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে, "এ সম্পত্তি আমার নয়। আমার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে এত ঋণ পরিশোধ করে, তা রক্ষা করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। যিনি তা' করেছেন, সম্পত্তি তারই; তাঁকেই দিব। আমি কিছুই রাখ্‌ব না।" তিনি সম্পূর্ণ সম্পত্তি দামাদ-কন্যার নামে সমান ভাগে দানপত্র করিতে প্রস্তাব করিলেন। কিন্তু দামাদ তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া বলিলেন, "আব্বাজান, আপনার আরও পুত্র কন্যা আছে। অল্প দিন আগে আমি খবর করেছি, তাহারা খোদানুগ্রহে এখনও বেঁচে আছে এবং সুখে স্বচ্ছন্দেই জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। এমতাবস্থায় আমাদের সম্পত্তি দান করা লোক সমাজে অরুচিকর হ'বে; বিশেষতঃ খোদার নিকট দায়ী হ'তে হবে। আপনি প্রবীণ, আমি বালক, আপনাকে বেশী কি বল্‌ব? তবে আমার সম্বন্ধে, আপনি আমাকে যে অর্দ্ধ সম্পত্তি দান কর্‌তে চেয়েছেন, আপনার সন্তোষের জন্য আমি তাহা গ্রহণ কর্‌লাম্‌। কিন্তু আমি আবার স্বেচ্ছায় তাহা আপনার পুত্রকন্যাদিকে অর্পণ কর্‌লাম্‌। আশা করি, আপনি তা'তে কোন আপত্তি কর্‌বেন না, ইহাই আমার শেষ অনুরোধ। এখন জানি না, তাঁর অভিপ্রায় কি?" কাজী সাহেব দামাদের কথায় সায় দিয়া বলিলেন, "বাবা আমি কিছু জানি না, সব তোমার ইচ্ছা, যা'তে ভাল হবে বিবেচনা হয়, তাহাই কর; আমার কোন আপত্তি নাই। আর আমি এ জটিল পরীক্ষায় প্রবেশ কর্‌তে চাই না; দুনিয়া কঠোর পরীক্ষার স্থল, বাবা! এ বুড়া ব'সে তাতে প্রবেশ কর্‌তে ভয় হইতেছে। ঋণের দায়ে জীবন বিক্রয় কর্ত্তে হ'ত। ঋণের দায়ে স্নেহের

পুত্র কন্যা দাস-দাসী সেজে আজ অপরের সেবায় নিযুক্ত থাক্‌ত। ওহো কঠোর পরীক্ষা! ঋণ-রাক্ষসীর বিষ-মাখা ভীষণ-বাণের যাতনা আর সহ্য কর্‌তে হবে না। অসহ্য! অসহ্য!! সর্পবিষপানেও এত যাতনা অনুভূত হয় না! যাক্‌ বৎস, তুমি মহানুভব; আমি দরিদ্র। অপরের সহায়তা ব্যতিরেকে আমার আর কি সঙ্গতি আছে! পরের সহানুভূতি, পরের অনুগ্রহ এখন যে আমার জীবনের একমাত্র উপায়। তাই বাবা দয়া করে, যে প্রকারেই ভাল বুঝ আমাকে বাঁচাও। তবে আমার এক অনুরোধ আমি আমার ছালেমাকে যে অর্দ্ধ সম্পত্তি দান করেছি তা' আর ফিরাইয়ে নিব না। আমার এ আপত্তি রক্ষা কর্ত্তেই হবে, বাবা।"

অতঃপর সুযোগ মত কাজী সাহেব তাঁহার দখলীয় ভূমি,—আজকালের বাজারে লক্ষাধিক টাকার সম্পত্তির অর্দ্ধাংশ—ছালেমার নামে এবং অপর অর্দ্ধাংশ দ্বিতীয় স্ত্রীর গর্ভজাত একমাত্র পুত্র আবদুচ্ছালাম ও কন্যা ফিরুজার নামে রেজেষ্টরীকৃত দলিল দ্বারা উইল করিয়া দিয়া সংসারের সংসারী সাজ পরিত্যাগ করিয়া অহরহ খোদার নাম-কথা ধ্যান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। আস্তে আস্তে কাজী সাহেবের দিন আবার ভাল হইতে লাগিল। এক যুগ—বার বৎসর নিঃশেষ হইল। এক-এক করিয়া পুরাতন বন্ধু-বান্ধব জুটিতে লাগিল। কিন্তু পূর্ব্ব কথা মনে করিয়া তিনি বর্ত্তমানে অত্যধিক লোক-সমাগমে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। দুনিয়ার কপট-মানুষের সঙ্গদোষে আবার তাঁহাকে বিপদে পতিত হইতে হয় কি না, সে ভয়ে তিনি খুব ভীত, চমকিত ও সতর্কিত হইয়া রহিলেন। যাহাতে চাটুকারেরা তাঁহার ধ্যানের ব্যাঘাত না ঘটায়, তন্নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টিত হইলেন। যখন কোন ধনী লোক তাঁহার নিকট আসিত তিনি তাহার নিকট অনেক টাকা ধার চাহিয়া বসিতেন;

আবার যখন কোন দরিদ্র লোক আসিত, তখন তিনি তাহাকে কিছু টাকা দিয়া বিদায় করিতেন। ইহাতে ধনীরা টাকা ধার দেওয়ার ভয়ে, এবং দরিদ্রেরা প্রদত্ত টাকা আদায় করিতে না পারিয়া লজ্জায় কাজী সাহেবেরনিকট আসা যাওয়া অধিক পরিমাণে বন্ধ করিয়া দিল। তিনি সম্প্রতি এ আপদ হইতে অব্যাহতি পাইলেন।

এ দিকে প্রফেসার-অব্-পার্শিয়ান আবদুল মন্নান, তাঁহার সৎ-শাশুড়ীর গর্ভজাত পুত্র আবদুচ্ছালাম ও কন্যা ফিরুজাকে অন্বেষণ করিয়া তাহাদের মাতুল-সম্বন্ধীয় কোন দূরসম্পর্কীয়ের বাড়ী হইতে খোঁজ করিয়া লইয়া আসিলেন এবং কাজীপাড়া গ্রামে পুরাতন বাটীর ভগ্নাবশেষের উপর কয়েক খানি সুরম্য-সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া অসহায়দের বসবাসের সম্বল করিয়া দিলেন। পুত্র ও কন্যাকে সাথী করিয়া বৃদ্ধ কাজী সাহেব, এত বিপদ ঝঞ্ঝাবাতের পরে আবার এখানে সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে লাগিলেন। প্রফেসার সাহেব তদীয় বিবী সাহেবার সহিত, অন্ততঃ সপ্তাহ মধ্যে একবার অশ্ব-শকটারোহণে কাজী সাহেবের সাক্ষাতে আসিতেন। ইতিমধ্যে প্রফেসার সাহেবের উদ্যোগে আবদুচ্ছালামকে উচ্চকুল-প্রসূতা, লজ্জাশীলা, সুন্দরী এক বিদুষী রমণীর সহিত বিবাহ দেওয়া হয়। ইহাতে কাজী সাহেবের শেষ জীবন, পুত্র, পুত্রবধু, কন্যা-জামাতার ভক্তি আবদারের মধ্যে বড়ই সুখে কাটিয়া যাইতে লাগিল। তিনি প্রত্যক্ষ ভাবে বুঝিতে পারিলেন, যে তাহার দুঃখ-জীবনের সময় উত্তীর্ণ হইয়াছে; এতদিনে আঁধারে আলো ফুটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি আরও বুঝিলেন, খোদাতালা ভিন্ন আর একত্বের প্রমাণ পৃথিবীতে কোথাও নাই। এক হাতে তালি বাজে না, এক পদে ভর করিয়া অগ্রসর হওয়া যায় না; একবৃন্তে কেবল এক ফুল ফুটিতে প্রায়ই দেখা

যায় না ; সাধারণতঃ একবৃন্তে দুই ব' ততোধিক ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া থাকে। এরূপ, আঁধার-আলো, উচ্চ-নীচ, ভাল-মন্দ, সরু-মোটা, স্বামী-স্ত্রী দিবা-রাত্রি ইত্যাদির ভিতর অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ লাগিয়াই আছে। যেমন আঁধার ছাড়া আলোর মূল্য নাই নীচে পতিত না হইলে উচ্চের মূল্য বুঝা যায় না, স্বামী-হীন নারী যেমন মরুময় জীবন বহন করে, অথবা মৃতদার যেমন সুখ-সম্পদে, দুঃখ-দৈন্যের আতিশয্যে সহায়হীন, তেমনি দুঃখ বিনা সুখের মূল্য সম্যক্ ভাবে বুঝা যায় না। গোড়াহীন চূড়ার যেমন কোন অস্তিত্ব নাই, কাঁটাহীন ফুলের যেমন আদর আদৌ থাকে না, সহজ-লব্ধ অর্থের অপব্যয় যেমন অতি সহজ তেমনি দুঃখহীন সুখের কোন মূল্য নাই। বিপদহীন জীবন অনুভূতি-শূন্য। দুঃখস্বরূপ দগ্ধ-ইস্পাত দ্বারা পাপরূপ-ময়লা পরিমার্জ্জিত না হইলে, শরীরে সুখের বাতাস লাগিবে কি করিয়া ? বাস্তবিক, কাজী সাহেবের মধ্য-জীবনটা দৈন্য ও অমানুষিক নির্য্যাতনের ভিতর দিয়া অতিবাহিত হওয়ায়, শেষ জীবনের সামান্য সুখেও তিনি হাসিতে হাসিতে খোদার শুকুর-গুজারী করিতে লাগিলেন ; এ বাড়ীতে কাজী সাহেবের একখানা ছোটখাট বাহির-বাড়ীও অন্দরমহল হইল। তিনি বাহির-বাড়ীতে থাকেন না ; দরকার হইলে মাঝে মাঝে আসেন। অন্দর-মহলেই সচরাচর থাকেন। তথাপি আবার কেন, কি সম্পদের গন্ধে যেন অনেক বন্ধুবান্ধব জুটিয়াছে। তিনি কিছুতেই জন-কোলাহল আশানুরূপ এড়াইতে পারিতেছেন না। বিপন্ন যাহারা, তাহাদের বিপদ-কাহিনীর বর্ণনা করিয়া দুঃখের কথঞ্চিৎ লাঘবতা করিবার একমাত্র উপযুক্ত ব্যক্তিই কাজী সাহেব ; তিনিই এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞ, তাই এই শ্রেণীর লোকদের যাতায়াত শত চেষ্টায়ও রোধ করা অসম্ভব হইয়া উঠিল। আর আর লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই এত

পরিবর্ত্তনের পর কাজী সাহেবের সহিত দেখা করা সঙ্গত মনে করিয়া লইয়াছে; তাই তাহারাও আসে। এক কথায় বলিতে গেলে, কোন না কোন ব্যক্তি সর্ব্বদাই তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতে দেখা যায়। আসিতে যাইতে যে-সে ধন্য ধন্য বলিয়া কাজী সাহেবের সহিষ্ণুতা ও সততাকে বাতাসের সহিত চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া দিতে লাগিল। আর, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দেশ বিদেশে তাহার প্রতিধ্বনি করিয়া সুখ অনুভব করিতে লাগিল। ছালেমার স্থলোপবিষ্টা হইয়া ফিরুজা পূর্ব্বের মত কাজী সাহেবের চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল। ফিরুজা বিনীতা, সৎ-স্বভাবা সুন্দরী ও মধুরালাপী। ইহাকে দেখিলেই মনে হয় সে যেন তাহার হিংসা-বিদ্বেষ-আত্মাহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যে জর্জ্জরিত মাতার সন্তানই নয়। এ যেন 'গোবরে পদ্মফুল' প্রস্ফুটিত হইয়াছে।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

আদর্শ বক্তৃতা।

পাঠক, বড়সুন্দর গ্রামে ছালেমার মামাবাড়ীতে, কিছুদিন পূর্ব্বে, একজন দারোগাও একটি যুবকের ভিতর নানা প্রকার আলাপ শুনিয়া আপনারা অবাক হইয়া পড়িয়াছিলেন। বাক্‌বিতণ্ডার পরে দারোগা তথা হইতে প্রস্থান করিলে আমরাও তাহার সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর চলিয়া গিয়া পথভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলাম। অই এ যাবত ঐ যুবকটীর কোন অনুসন্ধান করিতে পারি নাই। যদিও সে কে, আপনারা তাহার একটা মোটামুটি ঘ্রাণ পাইয়াছেন, তথাপি আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে তাহার কোন আলাপ হয় নাই। যুবকটি যে ফাইন্যাল মাদ্রাসা পরীক্ষা পাশ করিয়া তখন বি, এ, পড়িতেছিল, তাহাও দাবোগার সহিত আলাপেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি দারোগার প্রস্থানের অব্যবহিত পরেই নমাজে যোগদান করিতে গেলেন। নমাজ পাঠান্তে তিনি মস্‌জিদে উপস্থিত জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করিয়া ওয়াজ করিতে আরম্ভ করেন। "ভাই মুসলমান, যদি তোমরা ইস্‌লামের শান্তিময় সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করিতে চাও, যদি ইস্‌লামের অমৃত পান করিয়া চির-নীরোগ হইতে চাও, তবে তার প্রধান অঙ্গ নমাজকে অবহেলা করিও না। পৃথিবীতে যতই করি-না-করি, সকল সময় মূল লক্ষ্য ত্রিবিধ উন্নতি—দৈহিক, নৈতিক, আর্থিক – ইহাদের অন্ততঃ যে কোন দুইটা সাধন করিতে না পারিলে, মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। যদি একটিও কাহারও

দ্বারা সংসাধিত না হয়, তবে সে মানুষ নামের অনুপযোগী। পশু ও মানুষে তুলনা চলে না। আকারে বিভিন্নতা লক্ষিত হইলেও প্রকারে এক। আমাদের বিশ্ব-বিজ্ঞান-সঙ্গত নমাজে এ ত্রিবিধ উন্নতি নিহিত আছে। ইস্‌লামের এই নমাজ দ্বারা নিয়মানুবর্ত্তিতা, সময়ের মূল্য, একতা, গর্ব্বের খর্ব্বতা এবং শারীরিক সুস্থতা-রক্ষা কি এক অচিন্ত্য বুদ্ধিমত্তার সহিত শিক্ষা হইয়া থাকে! সর্ব্বপ্রথম, আমাকে নমাজে প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বে অজু, গোছল, এবং পবিত্র পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করিতে হইবে। তাহাতে মস্তিষ্কের বিকৃতি, কুচিন্তা, অসুস্থতা, এবং মানসিক জড়তা ও অশান্তি দূরীভূত হইয়া যায়। যে কোন প্রকারের অশান্তি-বিবর্জ্জিত শান্তির প্রতিমূর্ত্তি-স্বরূপ নমাজে একাগ্রচিত্তে দণ্ডায়মান হইতে হইবে। ইহা ইস্‌লাম-জগতের জবরদস্তির কথা নহে, ইহা সর্ব্ব-সভ্যজগতের বিজ্ঞানবাদীদের যুগযুগান্তরব্যাপী সাধনা-প্রসূত, পুঞ্জীকৃত আবিষ্কার বই আর কিছুই নহে। কারণ শান্তি না হইলে ধ্যানের মত ধ্যান অসম্ভব। অশান্ত মনে জোর করিয়া ধ্যানে নিযুক্ত হইলে তাহা বেবিলনিয়ান্ বর্ব্বর ভাষায় পরিণত হয়। এই গেল, শান্তিময় শান্তির আধার—নমাজ-গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বভাব। ক্ষিতি অপ্ তেজ মরুৎ ব্যোম, এই পঞ্চভূতের শরীরকে রাগ-রোষ, লালসা, ভীরুতা, দাম্ভিকতা ও কপটতা হইতে নিরাপদ করিয়া সেই অনিন্দ্য শান্ত্যাধার নমাজে প্রবেশ করিলে তুমি যে কি সুখ অনুভব করিবে তাহা ভাষায় ব্যক্ত করিতে আমি অক্ষম। খোদা সেই সুখের বিবৃতি-শক্তি লোকের মনে দিয়াছেন—সে চিন্তা করিতে পারে; মুখে দেন নাই—তাই বর্ণনা করিতে অক্ষম। তারপর ভাই মুস্‌লেম্, নিয়মানুবর্ত্তিতা শিক্ষার কি সুন্দর কৌশল! সে সম্বন্ধে অশেষবিধ প্রমাণ হইতে আমি একটী

মাত্র আলোচনা করিব। সূর্য্য উদিত হইবার পূর্ব্বেই নমাজ আদায় করিতে হইবে; যদি না করি—মোটামুটি না বলিলেও নয়—তাহা হইলে স্নানের বেলায় পাইখানায়, খাওয়ার বেলায় স্নানে, আর প্রায়ই ট্রেন চলিয়া যাওয়ার দুই চার মিনিট পরে ষ্টেশনে যাইতে শিখি। আর যদি সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যথাসময়ে নমাজ পাঠ সমাধা করি, তবে পারলৌকিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মলয় পর্ব্বতের স্নিগ্ধ সমীরণ গায় লাগিলে মানসিক এবং শারীরিক উন্নতি সাধিত হয় না কি? এ সৌভাগ্যের স্পর্শ সকল হতভাগার হয় না, ভাই; বিষয়াসক্ত মানব সমূহের এক ঘেঁয়ে কলরবে দুনিয়া তখনও বিষাক্ত অপবিত্র হয় নাই। তাহা দর্শনোপযোগী মানুষ না হইলে দেখিবেই বা কি করিয়া? ঐ সুখের প্রাতঃ সমীরণ যখন গুরু-গাম্ভীর্য্যের সহিত বহিতে থাকে, তখন হতভাগারা নাক ডাকাইয়া নিদ্রোপভোগ করে। তাহারা জানে না, জীবন-প্রদীপ প্রতিনিয়ত ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতেছে। মাঝে মাঝে অর্দ্ধ নিদ্রায় অথবা প্রায় জাগ্রতাবস্থায় কুস্বপ্ন দেখিয়া, 'গেলাম রে, মইলাম্ রে,' স্বরে চীৎকার করিয়া, শয়তানের প্রস্রাবে—নাপাক মুখের জলে উপাধান সিক্ত করিয়া তোলে। আর তাহারই উপরে কোমল গণ্ডদেশ রাখিয়া নাসিকাদ্বারা বালিশের ময়লা-মিশ্রিত মুখের-লালা কফের দুর্গন্ধ অনুভব করিতে থাকে। তুচ্ছ মানবের বুদ্ধি! যার যত ভাব, তার তত লাভ। ঐ দিকে ঊষার বাতাসে বনবকুল হইতে সুঘ্রাণের আমদানী হইতেছে, কিন্তু উপভোগকারীর অভাবে, কাট্তি হইতেছে না দেখিয়া, নিদ্রিত হতভাগাদের দ্বারে-দেওয়ালে আঘাত করিয়া, কোন সাঁড়া না পাইয়া, আবার আর এক জনের অনুসন্ধানে চলিয়া যাইতেছে। তথাপি অলস-তুমি আদরের জিনিষ পায়ে ঠেলিয়া কি কুৎসিত অভ্যাসের কেনা দাস হইয়া পড়িয়াছ? অতি

নিদ্রায় আয়ুক্ষয়, স্বাস্থ্যক্ষয়, অর্থক্ষয় এবং অশেষবিধ অবনতির সঙ্গে সঙ্গে ত্রিবিধ উন্নতির পথও অবরুদ্ধ হইয়া পড়ে। নমাজ খোদার আদেশ—আমাদের অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য—সমাধা করিতে হইবেই। নতুবা দোজকের আগুনে জ্বলিয়া পুড়িয়াও সহ্য করিতে হইবে। ·········
এখন দেখি, নমাজে যোগদান করিলে, আরও কোন শারীরিক উন্নতি হয় কিনা। যখন আমরা নমাজে প্রবেশ করি, খোদার নির্দেশানুযায়ী তখন আমাদিগকে কোরাণের সূরা-কেরা'ত কণ্ঠস্থ পাঠ করিতে হয়। তৎসঙ্গে তাহাদের আধ্যাত্মিক অর্থের প্রতিও দৃষ্টি করিতে হয়। মন চঞ্চল, অথবা অস্থির হইলে, অথবা মানসিক দুর্ব্বলতা আসিলে, নিয়মানুযায়ী পাঠ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে অর্থের প্রতিও গভীর ধ্যান রাখা অসম্ভব। মন ধীর, স্থির ও শান্ত হওয়া আবশ্যক। ইহাতে দিন দিন অভ্যাস গুণে মানসিক উন্নতি সাধিত হয়। মনের উন্নতি হইলে, তাহার চির-সহচর শরীরের উন্নতিও অবশ্যম্ভাবী। নমাজের ভিতর নিশ্চল প্রস্তরের মত দাঁড়াইয়া অথবা বসিয়া থাকিলে চলিবে না। রীতিমত ধর্ম্মগ্রন্থ-সম্মত অঙ্গচালনা করিতে হইবে। তাহাতে শরীরের সূচ্যগ্র পরিমাণ অংশও পরিচালিত হইয়া থাকে। শিক্ষিত জগতে ব্যায়ামের যে সকল বৈজ্ঞানিক বন্দোবস্ত আছে, তাহাতে যে পরিমাণ অঙ্গচালনা হয়, নমাজে তাহা হইতে কোন অংশেই কম হয় না। এই চালনা অপরিহার্য্য; এরূপ করিয়া নমাজ আদায় করিতে হইবেই। বে-নমাজি এই বিবিধ সুখ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত থাকিবে। অতএব আগামীতে সকল মুসলমানই রীতিমত নমাজে যোগদান করিয়া ইহ-পরকালের সম-সুখ উপভোগ করিবে, ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা। আজ সময় সঙ্কীর্ণ বোধে, বিশেষতঃ মানসিক অস্থিরতাহেতু আর বলিতে পারিলাম না। তাই এখন বেয়াদবী মাপ চাই।"

ওয়াজ শেষ হইলে সকলেই সসম্রমে দাঁড়াইয়া যুবক মৌলবী সাহেবকে ছালাম করিল; কেহবা অগ্রসর হইয়া করমর্দ্দন করিয়া তাঁহার আদর্শ বক্তৃতার ভূরি ভূরি প্রশংসা জানাইল। অতঃপর তিনি আস্তে আস্তে বাড়ীরদিকে রওয়ানা হইলেন। বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করার পূর্ব্বেই শুনিতে পাইলেন, তিন জন লোকের ভিতর নানা প্রকার কথাবার্ত্তা চলিতেছে। কণ্ঠস্বরে তিনি দুই জনকে চিনিতে পারিলেন কিন্তু এক জনকে চিনিতে পারিলেন না। উপরোক্ত পরিচিত ও অপরিচিত লোকত্রয়ের ভিতর এরূপ আলাপ চলিতেছিল :—

অপরিচিত—দল-বল সহ আস্‌ছিল, তবে গ্রেপ্তার কর্‌ল না কেন?

১ম পরিচিত—দারোগা আমাদের মন্নান মিঞার নাকি হাম্‌ছব্‌কী। এক সঙ্গেই ছোট কালে স্কুলে পড়েছে। তাই সম্ভব, গেরেপ্‌তার কর্‌তে এসেও, খাতিরে পড়ে আর কোন কথাই বল্ল না।

২য় পরিচিত—মন্নান মিঞার সাথে দারোগাটার গলাগলি দেখে আমরা আশ্চর্য্য হইলাম। যেন তারা ভাই-ভাই!

অপরিচিত—প্রথম এসে দারোগা কি বল্ল?

১ম পরিচিত—তা আর, বাবা, আম্‌রা ত দেখিনি, বাহিরবাড়ী থেকে বারেন্দায় আইসা-ই, চেয়ারে বইসা টুম্‌টাম্‌ করে কি আলাপ জুড়ে দিল। তা' শুন্‌লেও আমাদের হাসি পায়! বুঝা ত দূরের কথা। তবে তারা যে খুব দোস্তদার তা'তে আর ভুল নাই। সকল সময়ে কেবল হাসাহাসি দেখেছি।

২য় পরিচিত—না, চলে যাবার সমে বাংলা বলেছে। আমি পান তৈরী করে দিবার জন্য এখানে আস্‌ছিলাম, তখন শুনেছি লোকটা বল্ল, "আপনার কোন চিন্তা নাই, আপনি পরীক্ষার জন্যে প্রস্তুত হতে থাকুন, যাতে আপনাদের সম্মান রক্ষা হয় তা' আমি করব।" ইত্যাদি।

অপরিচিত—তবে কি খোদা আপনার পুত্রের হাতেই আমার হতভাগ্যা কন্যার রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেছেন, বুঝি? একবার ঐ জন-মানব-শূন্য চৌমুহনীর কোণে অমাবস্যা রাত্রির ঘোর অন্ধকারে, আবার এখন যমদূত সদৃশ পুলিশের কবল হইতে! ছালেমারপ্রতি যাও মা, তোমার হতভাগ্য পিতা আর তোমাকে লালন-পালন করতে অনুপ-যুক্ত ওঅক্ষম। যিনি বারংবার শত্রুর কবল হইতে রক্ষা করে তোমার সতীত্ব ও সম্ভ্রম বজায় রাখিতেছেন, পায়ে ধরিয়া তাহার চিরদাসী হইয়া থাক। সমস্ত সতীত্ব, সম্ভ্রম, সম্মান, কুলমর্য্যাদা ও অভিমান অকপটে তাহার পায়ে বিলাইয়া দিয়া নারী-জীবনে ধন্য হওগে। জানি মা, তুমি বিলাসীতার সুখ-ক্রোড়ে লালিত-পালিত, দুগ্ধ-ফেননিভ-শয্যায় নিদ্রিত। কিন্তু ইহাও জানি, তুমি মা, বিমাতার অযথা আক্রমণে, অনাদরে মর্ম্মান্তিক ব্যথা নীরবে সহ্য করিবার সহিষ্ণুতাও অর্জ্জন করেছ। কিন্তু তাহা মনে করিয়া অতীতের বোঝা ভারী করিও না। তাহা হইলে তাহাকে সুখী করিতে পারিবে না। আরও জানি মা, বীর তিনি, দাতা তিনি, জ্ঞানী তিনি, তাহার ভয় নাই, নির্লোভ তিনি, সংসার তাহাকে বাঁধিতে পারে না। তাই মা জোর করিয়া, ইচ্ছা করিয়া, এ সুখ-সম্মিলন বাসনা করি। স্বগত তবে আমি এখন যাই, আমার গল-পাশ ছিন্ন হয় নাই, আমাকে কয়েদে আবদ্ধ থাকিতে হইবেই। ইহা আমার পূর্ব্বকৃত পাপের ফল, এর আর নিষ্কৃতি নাই; নিষ্কৃতিরই বা প্রয়োজন? যার জন্য চিন্তা ছিল, তাকে সৎ পাত্রে অর্পণ করতে পারিয়াছি, ইহাই আমার সুখ।—ইহাই জীবনের একমাত্র কাম্য। এখন সেই মহানুভব মহাপুরুষ মেয়েটীকে সাদরে গ্রহণ করিলে বাঁচি।

ছালেমা—আব্বা, আব্বা, একি শুনলাম কাণে? গ্রেপ্তার! কার? আপনার? অসম্ভব। বৃথা পিতৃ ঔরসে জন্মেছি, যদি বাস্তবিক আপনি

গ্রেপ্তার, তবে আমিও গ্রেপ্তার, চলুন গ্রেপ্তার হইগে — ।

অপরিচিত—না না, ছালেমা, মা, অসম্ভব। তুমি নারী-জাতি! তোমাকে গ্রেপ্তার সাজে না, মানায় না। তুমি নিরপরাধ অবলা, তোমাকে গ্রেপ্তার হইতে যিনি রক্ষা করেছেন, তার প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হবে। আমিই একা যাই, আর আপত্তি করিও না, মা; এ দুঃখ জীবনের অবসান হইতে দাও। যাই মা! একবার নিকটে আস, এই বিদায় কালে —হয়তঃ এই চিরবিদায় কালে—যেমন দশ-বারো বৎসর আগে কাঁধে-চোকে দাঁড় করাইয়া তোমার স্বর্গীয় আবদার পরাণ ভরে উপভোগ করেছি, তেমন আর একটি বার করে যাই। এ অন্তিম আবদার মৃত্যুর মুহূর্ত্তেই স্মৃতিপথে অবরুদ্ধ থাক্‌বে।

পিতার আক্ষেপে ছালেমা যখন তাঁহার গলা ধরিয়া কাঁদিতেছিল, তখন নিকটবর্ত্তী আঙ্গিনা হইতে মৌলবী আবদুল মন্নান ঘরে প্রবেশ করিয়া কাজী আবদুর রসিদ সাহেবকে কদমবুছি করিলেন এবং বলিলেন, "আপ্‌নাদিগকে এ বিষয়ে কোন চিন্তা কর্‌তে হবে না, আমি সব মীমাংসা করে ফেলেছি। ওয়ারেন্টনামা সহ যে দারোগা এসেছিল, ও আমার পরম বন্ধু; চাক্‌রীর জন্য দরখাস্ত করে আমাকে মিলাদ শরিফ ও দোয়া কর্‌বার জন্য দাওয়াত করেছিল, খোদার হুকুমে চাক্‌রী হয়েছে অবধিই আমাকে নেহায়েত খাতির করে চলে। যে ভাবেই হউক পুলিশের গোলমাল সে-ই মিটাইয়া দিবে। আপনি নিশ্চিন্তে স্নানাহার করুন, আমি কাল না হয় দারোগাকে এখানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে আস্‌ব। তখন সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে সব জান্‌তে পারবেন।"

ছালেমা এতক্ষণ মৌলবী আবদুল মন্নানের কথা গুলি গভীর মনোযোগের সহিত শ্রবণ করিয়া একটু মাত্র সজলনেত্রে তাহার

দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া লাবণ্যময়ী শরীরের কমনীয় সঞ্চালনে একটু পর্দ্দার আড়ালে যাইয়া দাঁড়াইল। প্রায় ঘণ্টা পরিমাণ কেহ একটী কথাও বলিতে পারিল না; কি যেন এক কী সকলকে আত্মসাৎ করিয়া বসিয়াছে। সকলেই গভীর নীরবতা উপভোগ করিতে লাগিল। মৌলবী আবদুল মন্নান প্রথম পরিচিতকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "দাদী-আম্মা এখন আর ব'সে থেকে ফল কি? বোধ হয় দু'তিন দিন তিনি জলযোগই করেন নি। তাড়াতাড়ি স্নানাহারের বন্দোবস্ত করুন।" দাদী-আম্মার ইঙ্গিতে তাহার মা ছালেমাকে সঙ্গে করিয়া রন্ধন-শালায় চলিয়া গেলেন। এদিকে মৌলবী আবদুল মন্নান ও কাজী সাহেব যথাবিহিত পরামর্শাদির পরে স্নান করিতে গেলেন। ছালেমার নিপুণতা ও সাহায্যে মৌলবী সাহেবের মাতা আধ ঘণ্টার ভিতরেই অন্নব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিয়া খাওয়ার জন্য ডাকিলেন। উভয়েই স্নান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইত্যবসরে দাদী-আম্মা মৌলবী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার পরীক্ষার আর কত দিন দেরী" মৌলবী সাহেব বলিলেন, "বেশী দেরী নাই, মাসেক-পনের দিন : এ কয়েক দিন আমাকে মেছে থেকে পড়্তে হবে। ওখানে সময় মত সাহায্য পাওয়া যাবে। কিন্তু—খোদা বেহেস্ত নসিব্ করুক—আব্বা ছাহেব ত নাই যে বাড়ী ঘর দেখ্বেন। আর কেহও নাই যে বাড়ীতে রেখে যাই। কি করি?"

দাদী আম্মা—কেন? খোদার ইচ্ছা সফল হয়েছে। দুলা-মিয়া আর বাড়ীতে গিয়াই বা কি করবেন? খোদা যেখান থেকে ঠেলে ফেল্তে-ছেন, ওখানে আর যাওয়ার কাম নাই। খোদার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক। যে কয়টা দিন বাঁইচা আছি, মিলে-মিশে কেটে যাই। সহর থেকে এসে ঐ বাড়ী-ঘর সম্বন্ধে যা কর্তে হয় তুমিই করিও। এ বেচারা

এসব বিষয়ে মনোযোগ করলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে যে! আর আমার সাধের ঘরের নাত্নী ঘরেই এসেছে, এ ত আমার ইচ্ছা। এখন খোদা ভরসা।

মৌলবী সাহেব—তবে ত বড়ই মেহেরবানী হয়। ফুফাজি যদি এ গরীব বেচারার এখানেই থাকেন তবে ওনার কোন উপকার না হলেও আমার মহৎ উপকার হবে। এতে কোন আপত্তি নাই ত ফুফাজি?

কাজী সাহেব—আবার আপত্তি! এ ছাড়া আর আমার বসিবার স্থান কোথায়, বাবা? তোমার অনুগ্রহের ভিখারী আমি।

এত আলোচনার পরে কাজী সাহেব সম্প্রতি তাঁহার পূর্ব্ব বাড়ীতে—বর্ত্তমানে মানবহীন বন্ধুহীন, মনুময় বাড়ীতে—যাইতে ইচ্ছা করিলেন না। যবশেষে খাওয়া-দাওয়া সমাপ্ত হইলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া মৌলবী আবদুল মন্নান বি-এ পরীক্ষা দিবার জন্য এক মাস পূর্ব্বেই সহরে চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় কাজী সাহেবকে খুব বিনয়ের সহিত কদমবুছি করিয়া দাঁড়াইতেই তিনিও অত্যন্ত আদরের সহিত দুই হাতে নাক মুখ মুছাইয়া তাহার মঙ্গল কামনা করিলেন। বিদায়-অভ্যর্থনায় ছালেমার চক্ষু কোণে উজ্জ্বল মুক্তার মত দুই ফোটা অশ্রু দেখা দিয়াছিল, তাহা মৌলবী সাহেব ব্যতীত আর কেহই দেখিতে পান নাই।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

ভুতের কান্না।

অগ্রহায়ণ মাস। অনবরত থাকিয়া থাকিয়া বৃষ্টিপাত হইতেছে। রাস্তাঘাট বড়ই কর্দ্দমাক্ত। বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের রাস্তাঘাটের অবস্থা এই সময়ে বড়ই আপত্তিজনক। পথে হাটিতে লোকজনের পায়ের গড়ৎ গড়ৎ শব্দে পথিকের কান প্রায় বধির হইয়া উঠে। এরূপ এক-রাস্তা অবলম্বন করিয়া দুইটী লোক খুব সন্ত্রস্ত ও উদ্বেগপূর্ণ চিত্তে কোমরে কাপড় জড়াইয়া সহরের দিকে চলিয়াছে। ক্রমাগত পথ চলিতে চলিতে তাহারা পূর্ব্বাহ্ন দ্বাদশ ঘটিকার সময় সহরস্থিত বিচারালয়ে উপস্থিত হইল। দুই মিনিট কাল অতিবাহিত হইতে না হইতেই বিচার-গৃহের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পেয়াদা আবার ডাকিল, "লানতুল্লা আসামী হাজির হ্যায়, লানতুল্লা আসামী—কাঁহা লানতুল্লা আসামী?" তখন, এতক্ষণ আমরা যাহাদের সহিত কর্দ্দমাক্ত পথ চলিয়া আসিয়াছি, তাহাদের মধ্য হইতে অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ ব্যক্তি পুত্রের হাত ধরিয়া পেয়াদার নিকট উপস্থিত করিয়া বলিল, "হাজির হ্যায়, বাবু, হাজির হ্যায়। ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, কত বলে ক'য়ে নিয়া আস্‌ছি। দোহাই মহারাণীর, এ-ই আমার একমাত্র ছাইলা।" পেয়াদা জমাদারের এই বক্তৃতা শুনিয়াছিল কিনা জানিনা কারণ সে লানতুল্লাকে আরও দুইবার ডাকিয়া খোঁজ পায় নাই, তাই তৃতীয় ডাকে তাহাকে পাইয়া ঘাড়ে ধরিয়া তাড়াতাড়ি কাঠগড়ার ভিতর নিয়া অন্যান্য আসামীদের সহিত দাঁড় করাইল। কাছারীতে আর লোক

ধরে না, লোকে লোকারণ্য। সঙ্গীন দাঙ্গাহাঙ্গামা, তাতে আবার বলাৎকারের অপরাধী—আজ বিচারকের সম্মুখে করযোড়ে দণ্ডায়মান। সকলেই সতৃষ্ণনয়নে—বিশেষতঃ যাহার' এই গুণ্ডাদের দৌরাত্ম্যে গাঁয়ে সুখে-শান্তিতে বাস করিতে পারে নাই, আবার ইজ্জতের ভয়ে লোকসমাজেও তাহা প্রকাশ করিতে পারে নাই,—নীরবে ইহাদের দণ্ড কামনা করিতেছিল। শত শত নর-নারী এতদিন যাহাদের অত্যাচারে জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিয়াছে, তাহাদের বিরুদ্ধে আজ বিচার দণ্ড উপস্থিত। কি হয়, না হয় এই আশঙ্কায় সকলেই শ্বাস রোধ করিয়া থাকিল। কোন কথা বলিতে কাহারও জিহ্বা নড়িতেছে না। আবার কেহ-কেহ গুণ্ডাদের চোকের আড়ালে যাইয়া হাত মট্‌কাইয়া দাঁতে দাঁত কামড়াইয়া তাহাদের প্রতি কোনও কালের কৃত-অপরাধের প্রতিশোধ নিতেছে। অথবা অনুচ্চারিত ভাষায় তাহাদের প্রতি কঠোর দণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরের হুকুম জারি করিতেছে। যখন বিচারালয়ে ইত্যাকার অবস্থা, তখন বাহিরের দিক হইতে দুইজন একটু-কম-রকমের হাকিম মাথায় সামলা পরিধান করিয়া গম্ভীর ভাবে বড়-বিচারকের সম্মখস্থিত এক খানি হেলান-কাষ্ঠাসনে উপবেশন করিয়া উপস্থিত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কী-কী আলাপ জুড়িয়া দিলেন। আর মানুষ এখানে সেখানে বহ্নি-মুখ-পতঙ্গ পালের মত ছুটাছুটী করিয়া বিচার প্রকোষ্ঠের গবাক্ষ পর্য্যন্ত রোধ করিয়া বসিল। ইতিমধ্যে দুলাল গাজির ষোড়শী কন্যাকে বিচারকের ইঙ্গিতে সাক্ষ্য গ্রহণের নিমিত্ত হাজির করা হইল। তখনই একটু-কম-রকমের হাকিমদের ভিতর হইতে একজন স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া সাক্ষীর নিকটবর্ত্তী স্থান লইলেন এবং তাহাকে প্রশ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এতক্ষণে সকলে বুঝিল, ইহারা উকিল।

উকিল—তোমার নাম কি ?

যুবতী—জমিলা খাতুন।

উকিল—পিতার নাম ?

যুবতী—দুলাল গাজি।

উকিল—বাড়ী কোথায় ?

যুবতী—হরিপুর।

উকিল—বয়স ?

যুবতী—নিরুত্তর।

উকিল—স্বামী আছে ?

যুবতী—নিরুত্তর।

উকিল—অবিবাহিত, না ? আসামীদিগের প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া) তুমি ইহাদিগকে চেন ?

যুবতী—দুইজনকে চিনি, আর কাহাকেও চিনি না।

উকিল—কি করিয়া চিন ?

যুবতী—আমাদের বাড়ীতে গিয়াছিল।

উকিল—কবে ? এই মাসে, না গেছে মাসে ?

যুবতী—পরায় দুই চান্দ আগে।

উকিল—দু' চাঁদ আগে। আচ্ছা, তোমাদের বাড়ীতে কেন গেছিল ?

যুবতী—পর্‌থম্‌ কেন গেছিল জানি না, পাছে—।

উকিল—পাছে কি করেছিল ? সোজা কথায় বল্লেই ত হয়।

উকিলের প্রশ্নে যুবতী নিম্নলিখিত উত্তর প্রদান করিল।

প্রশ্ন—এ দুর্ঘটনা কখন ঘটেছিল ?

উত্তর—গত ৬ই বৈশাখ প্রায় রাত্রি ১২ টার সময়।

প্রশ্ন—তখন তুমি কি কাজে নিযুক্ত ছিলে?

উত্তর—বাড়ীর রান্না ঘরে আমি তখন খাওয়াদাওয়ার বন্দোবস্ত কর্‌তেছিলাম।

প্রশ্ন—সে ঘরে আর কেউ ছিল?

উত্তর—ঠিক সেই সময় কেহ ছিল না।

এই সময়ে বাদিনী বলিল যে বাহিরে কয়েকজন লোকের স্বর শুনিতে পায়। কিন্তু তাহাকে কোন চিন্তা করিবার অবসর না দিয়াই তাহারা কয়েকজন ঘরে ঢুকিয়া পড়িল।

প্রশ্ন—তুমি কি তাহাদের কাহাকেও চিনিতে পারিয়াছ?

উত্তর—হঁা, লানতুল্লা, হায়দর পহলওয়ানকে দেখিয়াছি। আরও কয়েকজন ছিল তাহাদের নাম জানি না।

প্রশ্ন—যখন আসামীরা গৃহে ঢুকিল, তখন কি সংঘটিত হইল?

উত্তর—একজন আমাকে ধরিয়া ফেলিল এবং বাহিরে টানিয়া নিয়া যাইতে চেষ্টা করিল। তাহাতে আমি বাধা দেওয়ায় আমার কাঁচের চুড়িগুলি ভাঙ্গিয়া হাতে 'জখম' হইয়াছে।

প্রশ্ন—তখন তোমার পিতা কি করিতেছিল?

উত্তর—তিনি বড় ঘরে মেহ্‌মানদের সহিত আলাপ করিতেছিলেন।

প্রশ্ন—তোমার মা কোথায় ছিল?

উত্তর—মা-ও বড় ঘরে পান তৈয়ারী করিতেছিলেন।

প্রশ্ন—তুমি কি সাহায্যের জন্য চীৎকার করেছিলে?

উত্তর—হাঁ প্রথমতঃ একবার মাত্র চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলাম।

প্রশ্ন—কেহ কি তোমায় উদ্ধার কর্‌তে আসিয়াছিল?

উত্তর—হাঁ, আমার চীৎকার শুনিয়া কুতুবপুরী লাঠিবাজেরা

আসিয়া আসামীদের সহিত মারামারি আরম্ভ করে। তখন আমার একটু জ্ঞান হইয়াছিল।

প্রশ্ন—যখন তোমার জ্ঞান হয়েছিল, তখন তুমি কি দেখিলে?

উত্তর—দেখিলাম, মা ও বাবা আমার শরীর জড়াইয়া ধরিয়াছে। আর কুতুবপুরী লাঠিয়ালদের সহিত দুর্ব্বৃত্তদের ভয়ানক লাঠালাঠি চলিতেছে; তখন আমার অত্যধিক তৃষ্ণা পাওয়ায় আমি এক গ্লাস পানি খাইতে চাহিলাম।

প্রশ্ন—অচ্ছা কত জন গুণ্ডা উপস্থিত হয়েছিল?

উত্তর—প্রায় ১৫।২০ জন।

প্রশ্ন—তুমি তাদের সবকে চিন?

উত্তর - কয়েকজনকে সেনাক্ত করিল।

প্রশ্ন—তুমি কি করে তাহাদিগকে চিন?

উত্তর—আমার পিতার একটি ছোট মুদী দোকান আছে। সে উপলক্ষে আমি ইহাদের নাম শুনিয়াছি এবং চেহারাও আমার মনে আছে। বিশেষতঃ ইহাদের মত দুর্ব্বৃত্ত আর এ দেশে নাই বলিয়াই লোকে বলে। সকলেই তাহাদের নামে আতঙ্কিত হয়। পূর্ব্বেও এদের নাম এবং স্বভাবের কথা বাবা-মার নিকট শুনিয়াছি.

প্রশ্ন—তার পর?

উত্তর—আমি আবার অজ্ঞান হইয়া যাই। তার পর রাত্রে কি হইয়াছে জানি না।

প্রশ্ন—সকালে কি হইল?

উত্তর দারোগা ও পুলিশ আসিয়া আমার ও বাবা-মার জবানবন্দি লইল।

সম্মুখ-টেবিল হইতে কতকগুলি কাগজপত্র হাতে লইয়া আবার

উকিল যুবতীকে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন।

উকিল—কোন প্রকার দাঙ্গাহাঙ্গামা, মারামারি হয়েছিল?

যুবতী—হাঁ, খুব জখ্‌মী হয়েছে বলিয়াও শুনিয়াছি।

উকিল—বেশ। যে তোমার গা স্পর্শ ক'রেছিল তার নাম জান?

যুবতী—এ লোকটী (লানতুল্লার দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া)

উকিল—মুখে কাপড় দিতে অগ্রসর হয়েছিল কে; তাকে চেন?

যুবতী—ঐ দিগ্‌লা মোটা মানুষটা; নাম জানি না।

উকিল—তার পর? তাড়াতাড়ি বল কি হয়েছিল।

যুবতী—জানি না তার পর কি হয়েছে। আমি বেহুস্ অবস্থায় ছিলাম।

সাক্ষ্য গ্রহণ শেষ হইলে, এই উকিল বসিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই দ্বিতীয় উকিল দাঁড়াইয়া যুবতীকে ক্রস্ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াও ব্যবহারজীবির বিচক্ষণ বুদ্ধির চাল-চালিয়াও যুবতীর কোন অসামঞ্জস্য আনয়ন করিতে পারেন নাই। যুবতী ধীর স্থির ভাবে অবনত মস্তকে সরলভাবে স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতে সকল প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিল। উকিল আর কোন কথা বলিবার সুযোগ না পাইয়া কেবল এ কথা বলিয়া বসিয়া পড়িলেন, "পুলিশ-তদন্তে খাতির করা হয়েছিল খুব, না?" ইহাতে নিকটে—দণ্ডায়মান দুলালগাজির চোক-মুখ লজ্জায় ও অবমাননায় লাল হইয়া উঠিল। সে গলায় অবরুদ্ধ ঢোক গিলিয়া কি বলিতে চাহিয়া সাহসের অভাবে বলিতে পারিল না। মাত্র বিচারকের দিকে একবার করুণ-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ক্ষান্ত হইল।

অনন্তর বিচারক, আলতাফ আলী খাঁ, তদন্তকারী দারোগা ও উভয় পক্ষের প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য গ্রহণান্তর মোকদ্দমার তারিখ দুই

সপ্তাহ সম্মুখদিকে সরাইয়া দিলেন ঐ তারিখে দুই পক্ষের উকিলদের সওয়াল-জওয়াব শুনিয়া হাকিম রায় দিবেন স্থির হইল। বিচারালয় হইতে বহিষ্কৃত হইবার সময় গ্রাম্যলোকদের ভিতর নানা প্রকার বাক্‌বিতণ্ডা চলিল। কেহ বলিল, "সাত বছর," কেহ বলিল, "তার ত কম হইতেই পারে না।" আবার আর একজন তার প্রতিবাদে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল, 'এত সোজা নয়, হয়তঃ পোর্ট্ বেলেয়ার; বিরহত্ মোকদ্দমা।" কাছারীতে উপস্থিত গ্রাম্যলোকদের ভিতরে ইত্যাকার আলাপ চলিতে থাকিল। কিন্তু এই কাল্পনিক মতামতের অনৈক্য হেতু মাঝে মাঝে দুই জনের ভিতর তুমুল সংঘর্ষও দেখা গেল। আর দুর্ব্বলেরা শারীরিক অনুপযুক্ততাহেতু যত শীঘ্র সম্ভব, বলশালীদের শারীরিক উপযুক্ততার নিকট বিনীত ভাবে হার মানিতে লাগিল। এই নানাবিধ অনাবশ্যক হট্টগোলের ভিতর দিয়া একরজ্জু আসামী শ্রেণীবিন্যাসে গারদের দরজায় উপস্থিত হইতে দেখা গেল। সকলেই চাহিয়া দেখিল, এই দলেই লানতুল্লা, হায়দর পহ্‌লওয়ান ইত্যাদি আসামীগণ মলিন বদনে শৃঙ্খলিত হইয়া আছে। নেজামত আলী জমাদার কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ির পর কোন প্রতিকার অসম্ভব বুঝিতে পারিয়া বাড়ীর দিকে রওনা হইল। যাইবার সময় হাত তুলিয়া, অঙ্গুলিসঙ্কেতে লোকজনকে শুনাইয়া বলিল, "খোদার মেহের-বানিতে খালাস পাইতে পায়। হাকিমের মত ভাল দেখা গেল।" তথা হইতে একটু দূরে সরিয়া লোক-শ্রবণেন্দ্রিয় এড়াইয়া, যখন দেখিল বাস্তবিকই নিকটে লোক নাই, তখন বলিল, 'খালাস ত বুঝিই বাপু, হয়ত এ-ই শেষ দেখা-শুনা। হাকিম ত বলে গেলেন, ৪৯৭ দঃ বিঃ অনুসারে তাহার ৫ পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড হইবে। দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিচার ত আছেই। বিচারকের মেজাজ যেরূপ কড়া তাতে

আইনতঃ শাস্তির পরেও আর কয় বৎসর বেশী কয়েদ হয় তারই বা নিশ্চয়তা কি ?” ইত্যাকার চিন্তা করিতে করিতে এবং খোদ-মতলবী প্রশ্নের খোদ মতলবী জওয়ার হেফজ করিতে করিতে অবশেষে প্রায় অর্দ্ধ রাত্রিতে জমাদার নিজ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। গৃহের দরজায় পদাঘাত করিয়াও পুত্রশোকে-কাতরা গৃহিণীর কোন সাড়া করিতে পারিল না। দরজার বাহিরে দাড়াইয়াই চিন্তা করিতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে তাহার প্রাণের উপর দিয়া প্রবলবেগে চিন্তার-বন্যা প্রবাহিত হইতে লাগিল। নিমেষ মধ্যে সে তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য ভুলিয়া গিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়া উর্দ্ধে তাকাইয়া চিন্তাস্রোতের করুণ-সুমিষ্ট সোঁ-সোঁ শব্দে কর্ণকুহরের স্বার্থকতা অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করিয়া দিতে লাগিল। তাহার মনে হইল “হায়, সংসারটা কার ? সংসার টাকার। তাতে আর বিচিত্র কি ? আমিই ত তার জলন্ত সাক্ষী।” তাহার চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বাহির হইতে লাগিল। শিরায়, শিরায়, ধমনীতে, ধমনীতে, বিদ্যুৎ ছুটিতে লাগিল। তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বিশাল ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতে ঘুরিতে তাহার মস্তকোপরি অস্তিত্বহীনতায় বিলীন হইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এ বিচিত্র-লীলাতেও সে নিষ্পন্দ, নিস্তব্ধ। জাগ্রতাবস্থায়,—দণ্ডায়মানাবস্থায় সে স্বপ্ন দেখিতে লাগিল। কি আশ্চর্য্য ; তবে কি মানুষ বাস্তবিকই দুর্ব্বল, সে কি বাস্তবিকই বিশ্ব-নিয়ন্তার হস্তস্থিত কলের পুতুল ? নিজে ইচ্ছা করিয়া কি একটুও শান্তি উপভোগ বা দুঃখ-যাতনা এড়াইতে পারে না ? অতি সাধের পুত্রকন্যা বা পিতামাতাকে দেখিবার জন্যও—পরিমিত বা নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত উপস্থিত হইলে চক্ষু গোলক প্রস্ফুটিত করিবার শক্তি নাই ? ক্রমে ক্রমে তাহার খরতর চিন্তাস্রোত মন্থর-গতিতে পরিণত হইল, নির্দ্দিষ্টদিকে চিন্তা করিবার শক্তি অর্জ্জিত হইল। তখন সে বুঝিতে

চেষ্টা করিল, "আমি কোথায়? আমার সেই প্রাণের সোহাগের তুমি কোথায়? বাছা, কার সঙ্গে একাকী সেই বন্ধুবান্ধবশূন্য কারাগারে আট্‌কে আছ? হায় আমার হৃদয়-মাণিক, চক্ষুর তারা। হায় আমার প্রাণমণি, কার জন্য এত লাঞ্ছনা ভোগ করিয়া—।" জমাদার বাষ্প-গদ্‌গদ্-স্বরে কাঁদিয়া ফেলিল। এতদিন পরে তাহার প্রকৃত পুত্রস্নেহ উথলিয়া উঠিল। আর বলিতে পারিল না, যাহা বলিল তাহা কান্নার সহিত মিলিত হইয়া এক দুর্ব্বোধ্য ও ভয়াবহ স্বরের সৃষ্টি করিয়া দিল। বিশেষতঃ এত রাত্রে হঠাৎ এত বিকট কান্নাধ্বনি শুনিয়া বাড়ীর সকলের প্রাণ ভয়ে কাঁপিয়া উঠিল। ক্ষণেক পরে এ-ঘর সে-ঘর হইতে কেহ বলিল, "ভূতের কান্না" আবার কেহ কেহ একটু সন্দেহ করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "পাগল! পাগল! পাগল!" "পাগল? হাঁ, পাগল বই আর কি; তবে পাগল চল্লাম।" এই বলিয়া বাস্তবিকই জমাদার পাগল হইয়া উঠিল। সেই ঘন-তিমিরাবরণে কোথায় নিরুদ্দেশ হইয়া গেল। কেহই তাহার সন্ধান পাইল না। হতভাগ্য জমাদার ধনগৃধ্নুতায়, ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া তাহার অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া ছারখার হইয়া গেল বাসনা-বৃত্তি, ভোগবিলাসকে সুখ-জীবনে কণ্টক-ময় বলিয়া কত ঘৃণা করিল, আবার এখনও ঐ শ্রেণীভুক্ত এক পার্থিব ভোগবিলাস বা পুত্রবাৎসল্যে স্থির থাকিতে পারিল না। খোদার ইচ্ছা সন্তোষের সহিত সমর্থন করিতে পারিল না। পুত্রকে ভুলিতে পারিল না, বরং বর্ত্তমান হৃদয়-বিদারক বিপদে অস্থিরতার পরিমাণ এত বেশী হইল যে, সে অবশেষে পাগল উপাধিতে ভূষিত হইয়া নিজের প্রাসাদ-বাড়ী হইতে বহিষ্কৃত হইয়া গেল। হায়রে অদৃষ্ট! এই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? মানুষ ভাবে এক, হয় আর।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জীর্ণ বিয়ে মেরামত।

সপ্তাহকাল অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া গেল জমাদার-স্ত্রী তাহার স্বামীর কোনও সন্ধান করিতে পারিল না। ইতিমধ্যে পুত্রকে কারাগারে আবদ্ধ করা হইয়াছে জানিতে পারিয়া কেবল উন্মাদিনী-বেশে ছুটাছুটী করিয়া বেড়াইতে লাগিল। পিতা-পুত্রের একসঙ্গে অন্তর্ধান অবলার প্রাণে দারুণ আঘাত করিল। সে একটীমাত্র নির্ব্বোধ বালক ও এক বিধবা কন্যাকে বুকে করিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে দিন কাটাইতে লাগিল। এদিকে নির্দ্দিষ্ট তারিখে হাকিমের বিচারে তাহার পুত্র ল্লানতুল্লার পাঁচ বৎসর জেল হইয়া গিয়াছে, ইহা বিশ্বস্তভাবে তাহার কানে পৌঁছিয়াছে। স্বামীর সন্ধান করিলে, এখানে সেখানে দেখিয়াছে বলিয়া অনেকেই সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। মোকর্দ্দমার তারিখে আদালতেও তাহাকে উপস্থিত দেখা গিয়াছে বলিয়া খবর পাওয়া গেল। কিন্তু মাসের পর মাস যাইতে লাগিল, একটী দিনের জন্যও সেই অহঙ্কারী, ধনগর্ব্বে মাতোয়ারা জমাদার তাহার কোনও দিনের 'হাঁ-হুজুরের দরবার' বা ইষ্টকাচ্ছাদিত অন্দর-মহল দেখিতে আসিল না। টাকা, কড়ি, দাইল, চাউল, যা' কিছু গৃহে মজুত ছিল, ইত্যবসরে তাহা নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অভাবের সময় তিনটী লোকের উদর নিষ্পত্তির খরচ কম নহে। তাহাতে আবার উপার্জ্জনক্ষম লোক একটীও নাই। এ সে করিয়া মাসাধিক অতিবাহিত করার পর আর গত্যন্তর নাই দেখিয়া জমাদার-স্ত্রী গৃহের আসবাব পত্র বাঁধা দিয়া কয়েক

দিন ঘর বাঁধা দিয়া, কয়েক দিন অবশেষে বাড়ী বাঁধা দিয়া পুত্রকন্যা লইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। তৎপর আর চলিতেছে না দেখিয়া অভিমান, লজ্জা, ঘৃণার মাথায় পদাঘাত করিয়া পুত্রকন্যাকে ভিক্ষার ঝুলী সাজাইয়া দিয়া নিজেও ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিল। তিনটী লোক—মাতা পুত্র কন্যা কাক-পিকের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে বাহির হইয়া যায়; আবার সম্ভব হইলে সূর্য্যাস্তের পুর্ব্বেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিয়া উপস্থিত হয়। এরূপ করিয়াই তাহাদের দিন কাটিতে লাগিল। প্রত্যহ গ্রামের পর গ্রাম, খাল, নালা, অতিক্রম করিয়া না গেলে তিন জনের ক্ষুণ্ণিবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ নিকটের লোকজন ভিক্ষার চাউল প্রচুর পরিমাণে দেয় না। এহেন কষ্টে পথ চলিতে অনভ্যস্থা স্ত্রীলোক ও পুত্র কন্যাদ্বয়ের জীবনভার তাহাদের নিকট অসহনীয় হইয়া উঠিল। তাহারা আর এত পরিশ্রম করিয়া জীবন বাঁচাইতে অনিচ্ছুক হইল। মাতা অগত্যা পুত্র কন্যাকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া একাকিনী ভিক্ষা করিতে যাইতে লাগিল। তাহাদিগকে দুই তিন দিনের সংস্থান করিয়া দিতে পারিলে, সে আর এখন প্রত্যহ বাড়ীতে আসে না! যেখানে সন্ধ্যা হয় সেখানেই অনুনয় বিনয় করিয়া কাহারও বাড়ীতে রাত্রিতে অবস্থান করে। আবার দুই তিন দিন পরে যাহা কিছু অর্জ্জন করে, তাহা পুত্র-কন্যাকে দিয়া চলিয়া যায়। ইহাই বর্ত্তমানে অবস্থাগুণে তাহাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের সুন্দর ব্যবস্থা হইয়া উঠিয়াছে।

ক্রমান্বয়ে স্ত্রীলোকটির সাহস বাড়িয়া উঠিল। সে একাকিনী যথেচ্ছা গমন করিয়া বেড়ায়। অদ্য সাহসে ভর করিয়া গ্রামের পর গ্রাম, তার পরও চলিয়া যাইতে লাগিল। অবশেষে অনেক ঝোপজঙ্গল অতিক্রম করিয়া পাহাড়ের উপরিস্থ বন-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই গ্রামে বন্য হিংস্র-পশুর ভয়ে, আর অনেক বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া আসিতে হয় বলিয়া, ভিক্ষুক-মিস্‌কিন্‌ কদাচিৎ আসিয়া থাকে। তাই জমাদার-স্ত্রী বহুল পরিমাণে ভিক্ষালাভের আশায় এতদূর আসিয়াছে এবং রাত্রি-কর্ত্তনের জন্য খুঁজিয়া একটী বাড়ীতে আশ্রয় গ্রহণ করিল। এ বাড়ীর কর্ত্তা রুস্তম সর্দ্দার ঐ পাহাড়ে অঞ্চলের অধিনায়ক। বন-গ্রামে দ্বিতীয়টী লোক নাই যে রুস্তম সর্দ্দারের সমকক্ষ হয়। তাহার প্রকাণ্ড বাড়ীতে একদিক হইতে সাদা ধপ্‌-ধপে্‌ উচ্চ টিনের ঘর সারি সারি দণ্ডায়মান। বাহিরে গোশালা গরু-মহিষে ভরপুর। চাকর-চাকরাণী তাহার নিত্য প্রয়োজনীয়; কয়েক দিন পূর্ব্বে একটা মোটা-সোটা নাতিবৃদ্ধ লোক অযাচিত ভাবে তাহার এখানে আসিয়া বেশ রীতিমত পুরুষ কাজ কর্ম্ম করিতেছে। যদিও রুস্তম সর্দ্দার প্রথমতঃ পাগল মনে করিয়া সন্দেহের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিয়াছিল, এবং 'পাগল' বলিয়াই তাহাকে সম্বোধন করিত, তথাপি তাহার কার্য্যকলাপ দর্শনে এখন আর খুব ডাহা-পাগল বলিয়া মনে হয় না। তবে মাঝে মাঝে হঠকারিতা, অস্বাভাবিক ক্রোধ, আবার মাঝে মাঝে অতি অমায়িকতা, অতি চিন্তা, লজ্জায় জিহ্বা কাটা, ইত্যাদি দেখিয়া একটু সন্দেহ হয়। এখন আবার একটী ভিক্ষুকিনীও অযাচিত ভাবে তাহার বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া তাহার মহানন্দ হইল। সে মনে মনে তাহাদের দুই জনকে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ করিয়া এখানেই উভয়ের সুদীর্ঘ অবস্থিতি সুনিশ্চিত করিতে কৃতসঙ্কল্প হইল। তাই অদ্য সন্ধ্যাতে দুই জনের মনের মিল ও সখ্য বুঝিবার জন্য রান্না-ঘর হইতে পুরুষ লোকটীর প্রয়োজনীয় অন্ন-ব্যঞ্জন নবাগত ভিক্ষুকিনীর দ্বারা তাহার নিকট পাঠাইয়া দেওয়া হইল। ভিক্ষুকিনী অন্ন ব্যঞ্জনসহ 'পাগলের' নিকট উপস্থিত হইয়া তাহা সম্মুখে স্থাপন করতঃ দুই পদ

পাছে সরিয়া দাঁড়াইল। বোধ হয় সে মনে করিতেছিল এরূপ একটা লোকের সহিত বিবাহটা হইয়া গেলেই নির্ব্বিবাদে দিন কয়টা কাটিয়া দেওয়া যাইত। তখন যে তাহার আকর্ণ-মুখমণ্ডলে চিন্তাশীলতা প্রচ্ছন্নভাবে প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছিল। রুস্তম সর্দ্দার কর্তৃক নিযুক্ত গুপ্তচরগণ অনায়াসেই তাহা বুঝিতে পারিয়াছিল। ভিক্ষুকিনীর মনে হইল, "কোনও দিন এরূপই একটা লোক আমার স্বামী ছিল। ইহারই মত স্ফীতোদর, খর্ব্বাকৃতি।" স্ত্রীলোকটি কৌতুহলপরবশ হইয়া পুরুষের দিকে তীক্ষ্ণ চাহনীতে আবার নিরীক্ষণ করিয়া দেখিল, এ লোকটা অবিকল যেন তাহার পূর্ব্ব স্বামী। শুষ্কচক্ষে অনেক দিনের পরে স্বামী-শোকে অশ্রু বিগলিত হইবার সম্ভাবনা দেখা গেল। কিন্তু সে অবিরাম চক্ষু গোলক আবর্ত্তনে ও ভ্রূসঞ্চালনে তাহা চক্ষু-চর্ম্মের ভিতরেই বিশুষ্ক করিয়া দিল। কিন্তু তাহার মনে একটা কথার যথেষ্ট তোলাপাড় হইলেও তাহা অব্যক্তই রহিয়া গেল। সরমে মরিয়া যায়, কি করিয়া বলিবে, "তুমি কি আমার স্বামী ?" এমন সময় নিকটবর্ত্তী ঘরের ছাঁইচ হইতে রুস্তম সর্দ্দারের পোষা তোতা ডাকিল, "বউ কথা কও।" এতচ্ছ্রবণে স্ত্রীলোকটা অবনত বদনে লজ্জার সহিত তথা হইতে চলিয়া গেল। রুস্তম সর্দ্দারের নিয়োজিত গুপ্তচরেরা এযাবত আড়ালে থাকিয়া তাহাদের গতি-বিধি লক্ষ্য করিয়া লইল।

রুস্তম সর্দ্দারের উদ্যম চেষ্টায় পরের দিনই 'পাগলে'র সহিত আমাদের ভিখারিণীর বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপিত করা হইল। পাত্র-পাত্রীর ব্যক্তিগত মত গ্রহণান্তর সেই দিনই তাহাদের উদ্বাহ ক্রিয়া সম্পন্ন করা হইবে স্থিরীকৃত হইল। বিবাহ-মজলিসে পাত্রকে 'কবুল' বলিয়া স্ত্রী-গ্রহণ করিতে বলায় সে বলিয়া উঠিল, "এক স্ত্রী কয় বার কবুল ?" একথায় সকলেই মজলিস-শুদ্ধ হো-হো করিয়া হাসিয়া

উঠিল। কিন্তু পাগল বলিয়া কেহই তাহার একথার বিশেষত্ব কিছু আছে কিনা বুঝিতে চেষ্টা করিল না। সকলেই তাহার কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। 'পাগল'কে 'কবুল' বলিবার জন্য খুব পীড়াপীড়ি করায় সে আবার বলিল, "আমি ত তালাক দেই নাই যে আবার কবুল করিয়া জীর্ণ বিয়ে মেরামত করিব?" তাহাতে সকলে আবার হো-হো করিয়া হাসির কোলাহলে গৃহখানিকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিন্তু রুস্তম সর্দ্দার এবার সকলের সহিত হাসিতে মাতোয়ারা না হইয়া পাগলের উচ্চারিত দুইটা কথারই ভাবের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিয়া লইল। সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "তোমরা সকলে চুপ কর। আমার মনে হ'তেছে যেন এখনি একটা গুপ্ত রহস্যের দ্বার উদঘাটিত হইবে। আর পাগলকে কোন কথা জিজ্ঞাসা কর্‌বার প্রয়োজন নাই। মেয়েলোকটীকে ভাল ক'রে সওয়াল করা যাক, দেখা যাক আমার ধারণা কতদূর সত্য।" এই বলিয়া সে তৎক্ষণাৎ মেয়েলোকটীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "মাগো, তোমার বাড়ী কোথায়? কে তোমার স্বামী? তিনি জীবিত কি মৃত—না নিরুদ্দেশ। তোমার ছেলে-মেয়ে আছে কিনা এবং এ ঘোর বিপদাপন্ন জীবনেরই বা কারণ কি তাহা সুস্পষ্ট আমাকে শুনাও। কোন কথা গোপন করিও না, তোমার ভাল হইবে।" স্বামীর নিরুদ্দেশ ও পুত্রের কারারুদ্ধের পর হইতে স্ত্রীলোকটী আর কাহারও মুখে 'মা' সম্বোধন বা ইত্যাকার অন্য কোন আবদার-সমাদর-সূচক কথা শুনিতে পায় নাই। অদ্য রুস্তম সর্দ্দারের 'মা' সম্বোধনে ছল ছল নেত্রে কাঁদিয়া গণ্ডসিক্ত করিয়া তুলিল এবং এক নিশ্বাসে তাহার স্বামীর পূর্ব্ব বিষয়, বিভব, সহায়-সম্পদের বর্ণনা করিয়া কাঁদিয়া বলিল, "বাবা, আপ্‌নি বাস্তবিকই আমার ধর্ম্মের বাবা। আর দুনিয়ায় আমার কেহই নাই; আপ্‌নাকে

প্রাণের সব কথা খুলিয়া বলিতেছি, শুনুন, "পুত্রের জেল হওয়ার পরেই একদিন রাত্রিতে আমার স্বামী উন্মত্তের ন্যায় পুত্রশোকে কোথায় চলিয়া গিয়াছেন। আজ প্রায় দুই তিন বৎসর চলিয়া যাইতেছে তাহার কোন সন্ধান নাই। জানিনা এখন জীবিত কি মৃত। কিন্তু আমার মনে হয় যেন ইনিই—। আচ্ছা, তা বাবা পরে বলিব। আপনার নিকট সব খুলিয়া বলিব, নতুবা আর কার নিকটে বলিব? তারপর, বাবা যা কিছু মজুত ছিল, মাতা-পুত্র-কন্যা তিন জনে তা খাইয়া শেষ করিয়া আর উপায়ান্তর নাই দেখিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছি। যা অর্জ্জন করি, দুই তিন দিন পর-পর ছেলেমেয়েকে দিয়া আসি, আবার ভিক্ষার উদ্দেশ্যে অন্যত্র চলিয়া যাই।" রুস্তম সর্দ্দার অবাক হইয়া এই সকল শুনিতেছিল। স্ত্রীলোকটীর বক্তব্য শেষ হইলে, সে বলিল, "যাও মা, 'পরে আর বলিতে হইবে না' সব বুঝিতে পারিয়াছি, কালই লোক পাঠাইয়া তোমার ছেলেমেয়েকে আমার এখানে নিয়া আস্‌তেছি। আর আমাদের 'পাগল' যে তোমার স্বামী নেজামত আলী জমাদার তাহাও এতক্ষণে বুঝিলাম। সকলেই তোমরা আমার গরিবালয়ে সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিতে পাইবে।" তৎপর রুস্তম সর্দ্দারের বাড়ীর এক পার্শ্বে জমাদার, তৎস্ত্রী ও পুত্র কন্যার বাসোপযোগী গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেওয়া হইল। তাহারা আবার স্বামী-স্ত্রীতে ঘনিষ্ট হইয়া ছোটখাট গৃহস্থের মত রুস্তম সর্দ্দারের কাজ কর্ম্ম করিয়া বেশ স্বচ্ছন্দতার সহিত সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে লাগিল। পুত্র লানতুল্লার কথা ব্যতীত এখন আর ইহাদের চিন্তা করিবার বিষয় কিছুই নাই।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

ভুল ভেঙ্গেনা।

"হা অদৃষ্ট! এ অল্প বয়সে কত কি দেখ্‌লাম! কোথায় ছিলাম, কোথায় গেলাম, কোথা হ'তে ফির্‌লাম্, এখন আবার কোথায় আস্‌লাম!! দুনিয়া পরিবর্ত্তনশীল; এ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে কোন জিনিষ উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করে, আবার কোনটী অধঃপতনের চরম সীমায় নিপতিত হয়! আমার বেলায় কি শেষোক্ত বাক্যটী সম্পূর্ণ সত্য নয়? বাল্য বয়সে ধনী-পিতার বড় আদরণীয় ছিলাম—দালান, দর-দালানের অধিবাসী। পিতার রাঙ্গা-চোকের প্রতি দৃষ্টি করিলে বাড়ীর কেহ কেন, গ্রামের একটি লোকও আমায় কিছু বল্‌তে সাহস পায় নাই। আজ পাঁচ বৎসরের ভিতর সে পিতার অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে কি আছে, তারই সন্ধান কর্‌তে পাচ্ছি না! মা, ভাই-ভগ্নি দুইটীর কথা না হয় নাই বল্লাম। বাড়ী ঘরের কথা জিজ্ঞাসা করে জান্‌তে পার্‌লাম, তা নাকি হস্তান্তর হয়েছে। অন্য লোকেরা নাকি তা' দখল করে বসেছে। এ কি! সব পরিবর্ত্তিত, ঘোর পরিবর্ত্তন! যখন আমার ভাল দিন ছিল, তখন এ রাস্তায় যাতায়াত কর্‌তে লোকজনের কত কষ্ট হইত। প্যাঁক-কেদোতে শরীর অপবিত্র হয়ে উঠ্‌ত। সে রাস্তা এখন কালের হাসিতে যেন হাসিয়া উঠেছে। একেত সুদীর্ঘ পাকা রাস্তা, তাতে আবার মাঝে মাঝে ঐ দেখ, দোকান বসেছে; আর ঐ যে পর-পর শ্রেণীবদ্ধ খুঁটীগুলো দেখা যায়, ওগুলিতে বোধ হয় গ্যাসের আলো লাগান,—

যেমন আমরা জেলখানাতে দেখেছি। এমন সুন্দর রাস্তা প্রস্তুত হতে টাকার প্রয়োজন মানি, কিন্তু আমার পিতার সুদের আয়ও ত কম ছিল না! তাতেই বা হল কই? সকল অর্থ-সামর্থ্য দাঙ্গা-ঝঞ্ঝাটে ব্যয়িত হয়েছে। আহা-হা, ঐ যে তরুণ বয়স্ক স্ববংশজাত সরলা-বালিকার প্রতি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ রাত্রিতে রাক্ষসী বিমাতার চক্রান্তে কী ভয়ানক উপদ্রবের প্রত্যাশা। লজ্জা! লজ্জা!! লজ্জা!!! রাক্ষসী বিমাতা! রাক্ষসী বিমাতা!!" অপেক্ষা করুন পাঠক, এই উদাসীন ব্যক্তির পরিচয় এখনি আপনার গোচর করিতেছি।

পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর লানতুল্লা জেল হইতে বাহির হইয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামাতার কোন খোঁজ করিতে পারিল না। তাহাতে যৎপরোনাস্তি শোক-সন্তপ্ত-হৃদয়ে সহর হইতে একটি পাকা রাস্তা অবলম্বন করিয়া চলিয়াছে। পাঠক, ইহাই আমাদের কাজীপাড়া হইতে বড়সুন্দরে চালিত অল্প-পরিসর রাস্তাটী। এই রাস্তার সঙ্গম-স্থলেই চৌমুহনীর কোণে কুমারী ছালেমার সতীত্ব নষ্ট করিবার উদ্যোগ করিতে যাইয়া দুরাত্মা লানতুল্লা প্রকৃতির অমায়িকতায় ব্যর্থমনোরথ হইয়াছিল। তাই সে অদ্য সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাহার অসচ্চরিত্রের পরিণাম ফল চিন্তা করিয়া আক্ষেপ করিয়া চলিয়াছে।

এই সময়ে কাজীপাড়ার দিক হইতে ফপ্ ফপ্ করিয়া একখানা চারিচাকার মটর গাড়ী বিদ্যুৎবেগে তাহাকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া গেল। তদভ্যন্তরে উপবিষ্ট জনৈক ভদ্রলোক রাস্তা-চলিত লোকটীর কথা শুনিয়া প্রথমতঃ শিহরিয়া উঠিলেন। তৎপর মাথা বাহির করিয়া তাহার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অধরে হাসি চাপিয়া বলিলেন, "তাই, তাই।" ভদ্রলোকের পার্শ্বে উপবিষ্টা রমণীও তদ্দর্শনে কোমল-বাহু-লতিকা গলায় বেষ্টন করিয়া কাণের নিকট মুখ নিয়া

তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ লোকটী কে?" তদুত্তরে তিনি ওষ্ঠদ্বয়ের অনতিদূরে-আকম্বিত লাবণ্য-পরিমার্জ্জিত গণ্ডদেশে চুম্বন-সুধা পান করিয়া কর-যুগল-লতিকা-বেষ্টন হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। ইত্যবসরে গাড়ীখানা লানতুল্লার অদৃশ্য হইয়া গেল। সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া যেদিকে গাড়ীখানা গিয়াছে সেদিকেই পথ চলিতে লাগিল। কিয়দ্দূর ভ্রমণ করিবার পর দেখিল, সম্মুখে একখানা দ্বিতল ইষ্টকালয়। চতুর্দ্দিকে উচ্চ প্রাচীর; প্রাচীরের গেটে সংলগ্ন একখানা ধবল-প্রস্তরে বড় বড় অক্ষরে লিখা—'Prof. Abdul Mannan' দ্বিতীয় পংক্তিতে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে লিখা—'Private' লানতুল্লা অতি কষ্টে কপালে হাত ঠুকাইয়া এই লিখাগুলি পাঠ করিল, কিন্তু ঐ নামের মালিক কে, এ সম্বন্ধে কোন ধারণা করিতে পারিল না। প্রাগুক্ত মটর গাড়ীখানা এই গেটের নিকটেই পড়িয়া আছে। ড্রাইভার-প্যাসেঞ্জার কেহই তথায় নাই। তখন সে বুঝিতে পারিল ইতঃপূর্ব্বে যে মটর-যাত্রীদের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইয়াছে, তাহারা এ বাড়ীরই অধিবাসী; গাড়ী রাখিয়া এই মাত্র ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। সে মনে মনে ভাবিল, "যদি এখানে দারওয়ান-পেয়াদার কোনও চাকুরী খালী থাকে, তবে আমি-হতভাগাকে সামান্য বেতনে অথবা বিনা বেতনে গ্রহণ করিবে কি? তা' হলে অক্লেশে কয়টা দিন গুজরান হত।" কয়েদী ভয়ে-ভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিয়া বরাবর অগ্রসর হইতে সাহস করিল না। খাস-প্রাসাদের পার্শ্বের দিক হইতে একটী ছোট ঘরে উপবিষ্ট লাল-পাগড়ী-পরিহিত এক চাপরাশী তাহার ঝকঝকে কোমর-বন্ধ সঞ্চালনে ইঙ্গিত করিয়া কয়েদীকে তাহার নিকট ডাকিল। কয়েদীর মনোভাব বুঝিতে পারিয়া সে ভাবিল, "এই ত স্বর্ণ সুযোগ, ছাহেব ত কহিয়া দিছেন, একটী চাকর চাই।

হামি এছ্‌কো পাকড়্‌কে ছাহেবকো পছ্‌ খাস্ কাম্‌রামে লে যাই।" যেমনি বলা, তেমনি কার্য্যে পরিণত করা। সে কয়েদীকে লইয়া খাস্‌ কামরায় আসিতেছে দেখিয়া ছালেমা উপরের তালা হইতে রুমালে মুখ ঢাকিয়া নিরীক্ষণ করিয়া দেখিতে লাগিল, এই যে লোকটী আসিতেছে, সে তাহার পরিচিত কিনা। প্রফেসার সাহেবও তখন আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ছালেমার পশ্চাদ্দিক অবরোধ করিয়া বলিলেন, "তাই, তাই বটে।" ছালেমাও প্রণয়ের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ওষ্ঠাধর সঙ্কুচিত করিয়া "আমি আর ওখানে থাক্‌বনা" বলিয়া ভিতরের দিকে যাইয়া পর্দ্দার আড়ালে স্বামীর প্রতীক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল।

এ দিকে চাপরাশি কয়েদীকে লইয়া তাহার 'ছাহেবের' সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ছালাম করিয়া দাঁড়াইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইয়ে আদ্‌মি কেয়া মাংতা হ্যায়?

চাপ্‌রাশী—ইয়ে কয়েদী হ্যায়, খালাস্‌ হোকে আয়া, আভি নওক্‌রি কর্‌নে মাংতা হ্যায়।

ছাহেব—তলব কেত্‌না চাহ ও আদ্‌মি?

কয়েদী—হুজুরের মেহেরবানী।

ছাহেব—তোমার বাড়ী কোথায়, নাম কি?

কয়েদী—আমি—আমি—আ—।

ছাহেব—ভয় নাই, লজ্জা নাই; ঠিক কথা না বল্লে আমি তোমাকে রাখ্‌বো না।

কয়েদী—আমার পিতার নাম নেজামত আলী জমাদার, বাড়ী দিলালেরপাড়া।

ছাহেব—আর তোমার নাম—লালতুল্লা, না?

কয়েদী—(অবাক হইয়া) হাঁ হুজুর।

ছাহেব—আমার এখানে থাক্‌বে কি? আমাকে এখনও চিনিতে পার নি?

কয়েদী আরও অবাক হইয়া বলিল, "না হুজুর, আপনার মেহেরবানী না হলে, গরীবের প্রাণ বাঁচান দায় হবে। আর আমার কেহ নাই। বেয়াদবী মাফ হয়, আমি কি জানাবের পরিচিত?

ছাহেব—তা বল্‌তে পারি না তবে—আমি কাজী আবদুর রসিদ সাহেবের দামাদ। মনে আছে? সে কয়েদী কাজী আবদুর রসিদের নাম শুনিয়া থর-থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। 'আমি কাজী আবদুর রসিদ সাহেবের দামাদ' এই কথা শুনিয়া মাটীতে পড়িয়া ভদ্রলোকটীর পা জড়াইয়া ধরিয়া প্রাণ ভিক্ষা চাহিতে লাগিল। তিনি তাহাকে অনেক সান্ত্বনা দিয়া 'কোন ভয় নাই' ইত্যাকার আশ্বাস দিয়া কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সামান্য কিছু বেতনও দিতে স্বীকার করিয়া চাপরাশীর সহিত বাহিরে পাঠাইয়া দিলেন।

ছালেমা পর্দ্দার আড়ালে থাকিয়া কয়েদী ও স্বামীর অবোধ্য সব আলাপ শুনিয়া অবাক হইতে অবাকতর হইতেছিল। সে চঞ্চলা হইয়া উঠিল। চাপরাশী ও কয়েদী স্থানান্তরে গমন করিলেই সে স্বামীর পার্শ্বস্থিত চেয়ারে বসিয়া পড়িল। রমণী পূর্ণ যুবতী, অতুলনীয় রূপসী; এখনও সন্তানের মা হইয়া শরীরের হেমকান্তি বা গঠনের কোনও বিকৃতি ঘটায় নাই। গণ্ডযুগল আল্‌তার জলে সদ্য-মুছান; মাথায় বেণী বাঁধা একরাশি চুল বেশ চক্‌চকে কৃষ্ণবর্ণ; তাহা আবার আ-কটী প্রলম্বিত। উদ্বেগ-পূর্ণ হৃদয়ে রমণী স্থান পরিবর্ত্তিত করিয়া উপবিষ্ট চেয়ারখানা স্বামীর সম্মুখে স্থাপন করতঃ তাহাতে চাপিয়া পড়িল এবং তাঁহার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল নেত্রে চাহিয়া রহিল।

স্বামী—কি হে সোহাগী. এত বিরাগ যে আজ!

ছালেমা—আমি এখন ওরূপ আ-কথা শুন্‌তে চাই না।

স্বামী—কেন, এখনি এ সব আ-কথাতে পরিণত হল? যৌবনের এ মধ্যাহ্নেই সূর্য্য-রশ্মির প্রাখর্য্য সব মিটিয়ে গেল!

ছালেমা—তা'হলে আমি আর এখানে থাক্‌লাম না, যাই।

স্বামী—না-না, না, যেয়ো না; আর বল্‌বো না।

ছালেমা—তবে শুনুন, এই যে লোকটা সে কে? তার সঙ্গে কি কথা হতেছিল, তা শুনে আমার যেন গা শিহরে উঠ্‌ছে। আমাকে শীগ্‌গীর তা না বল্লে আমি কিছুতেই ছাড়্‌ছি না।

স্বামী—খাটী সত্য বল্‌ব? তবে শুন—এ লোকটা আমার শ্বশুরের দামাদ, বুঝ্‌লে কি? আর স্বয়ং তোমার পূর্ব্ব-প্রণয়ী এবং বর্ত্তমানে কারামুক্ত আমার দারোয়ান।

ছালেমা—আরে জ্বালা! কি বক্‌ছেন? আমার প্রণয়ী? আমি আবার কবে—?

স্বামী তখন বাধা দিয়া বলিলেন, "জ্বালা! তাই গো তাই, তাই" আরও কি যেন গুপ্ত কথা কাণে কাণে বলিবার জন্ত বাহু-বেষ্টনে যুবতীর কণ্ঠ-শোভিত করিয়া কর্ণ-মূলের সম্মুখস্থ গণ্ডদেশটী অতিক্রম করিয়া কর্ণরন্ধ্রে তাঁহার গোপনীয় কথা বলিবার পূর্ব্বেই যুবতী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "পুরুষের মোটেই লজ্জা নাই, এখানে খোলা বারান্দায় বসিয়াই এমন—।" অবিলম্বেই যুবতী আসন পরিত্যাগ করিয়া অভ্যন্তরস্থ একটি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে যাইয়া অভিমানে শুইয়া পড়িল। আর স্বামীও তন্মুহূর্ত্তেই তাহার অনুগমন করিয়া শয্যাপরি উপবেশন করিয়া বলিলেন. "তা হলে নির্জ্জনে আসা হল, না?" যুবতী এই ব্যঙ্গ-উক্তিতে আরও অভিমানিনীর মত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া চক্ষু মুদিয়া

নিদ্রার ভান করিল। স্বামী আর তাহাকে না ক্ষেপাইয়া বলিলেন, "যাও তা হলে তোমারই জিত। এখন উঠ, বিষয়টী পরিস্কার ভাবে তোমাকে বুঝাইয়া বলি।" অনন্তর স্বামী ছালেমার চিবুক স্পর্শে সহাস্যে তাহাকে শয্যাপরি উপবেশন করাইলেন এবং কয়েদী ও তাহার ভিতরকার যে রহস্যময় আলাপে ছালেমার হৃদয়ে সন্দেহের তিমিরাবরণ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল তাহার মর্ম্ম তাহাকে সুস্পষ্ট বলিতে লাগিলেন, "প্রিয়ে, ঐ যে চৌমুহনীর কোণে—অমাবস্যা-রজনীর গাঢ় অন্ধকারে—, একাকিনী—।" তিনি আর বলিলেন না, কেবল মুচ্‌কি হাসিয়া নিকটবর্ত্তী কাষ্ঠাসনে বসিয়া পড়িলেন। তীরবিদ্ধ শিকারকে যেমন করিয়া শিকারী অনুসরণ করে, ছালেমাও তেমনি তথা হইতে ছুটিয়া গিয়া স্বামীর নিকটবর্ত্তী আর একখানা বেতস-লতায় নির্ম্মিত সোফায় "তার পর ?" বলিয়া মোমের মত গা ঢালিয়া দিল। তদ্দৃষ্টে স্বামী মোহিত হইয়া প্রাণের কবাট খুলিয়া দিয়া আবার বলিলেন, "প্রাণাধিকে, যেই দুরাচার পাপাত্মা, মামাবাড়ীর ভান করে তোমাকে অপহরণ করে স্বগৃহে নিয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করেছিল, সেই—।" ছালেমা বাধা দিয়া বলিল, "প্রাণনাথ, সেই দুরাচারই কি এ কয়েদী ? আমি আব্বার কাছে শুনেছি মাত্র, কিন্তু কোন দিন স্বপ্নেও যেন তোমা-ছাড়া কাহারও প্রণয়-দৃষ্টিতে পড়েছি বলে মনে হয় না। দ্বাদশ বৎসরে উপনীতা না হতেই তোমার প্রতিমা গড়ে মানস-মন্দিরে তোমাকেই "**জীবনের সাথী**" করে রেখেছি; দিনেকের তরে কেন, ক্ষণেকের তরেও কখন অন্য কোন জনকে কল্পনা করি নি; করিতে পারি নি। এ ব্যক্তিটী যে আবার কবে আমায় কলঙ্কিতা, অপহৃতা কর্‌তে চেয়েছিল, তাহাও ত মনে আসে না ! না, আমি আর কাহাকেও জানি না।" স্বামী বলিলেন, "প্রিয়ে, অনেক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়ে

তুমি এখানে। তাই সব ভুলে গিয়েছ, আর—।" যুবতী আর পারিল না, তাহার অনাবিল প্রেম উথলিয়া উঠিল। পাছে ঐ সকল পিছিলা কথা স্মরণ হইলে, মনে উদাসীনতা স্থান পায় বা অটুট-প্রেমের কোথাও টুটে যায়, সেই ভয়ে উচ্ছ্বসিত প্রেম-পাখা-সদৃশ বাহুযুগল বিস্তার করিয়া, "নাথ হে, আমি-তরণীর কর্ণধার, আমার ভুল ভেঙ্গনা। ভুলে হউক, জ্ঞানে হউক, যাকে কোন দিন কল্পনা করিনি, তার কথা স্মরণে আনিয়া আমার 'খেলার-ঘরখানাকে ধূলায় মিশাইও না, এই আমার শেষ অনুরোধ।" বলিয়া কতই না মিনতি করিল।

'ভুল ভেঙ্গনা' কথাটী স্বামীর কানে প্রতিধ্বনিত করিয়া কী এক অনন্ত ঝঙ্কারের সৃষ্টি করিয়া দিল! কী মনোরম, কী মধুমাখা কথা!" অটুট-প্রেমের কী অচিন্ত্য উপমা!!! একি দেবী, না মানবী, বুঝিতে না পারিয়া স্বামী যুবতীর হাত টানিয়া পলক-শূন্য-নেত্রে সেই স্বর্গীয় বদনের লাবণ্য ও মধুরতা অবলোকনে তন্ময় হইয়া রহিলেন।

সমাপ্ত